দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

ফতোয়া আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ফোরামে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন?? ৪
তাকফির বিষয়ক প্রশ্ন:- ১৩
নিম্নোক্ত লোকদের কি তাকফীর করা যাবে?? ১৬
সূরা আনফালের ৬৫-৬৬ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই..... ২১
থানা মসজিদে ইমামতি করার হুকুম প্রসঙ্গে ২৯
আরবী ফাতওয়াটির অনুবাদ..... ৩৪
মুজাহিদদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জাল নোট তৈরির বিধান..... ৩৯
হুকুমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তাবলিগ জামাতে বের হওয়া প্রসঙ্গে.....৪১
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া জানতে চাই?? ৪৫
বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে চাকরির বিধান জানতে চাই। খুবই জরুরী ৫১
জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন - মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিযাহুল্লাহ) ৬৫

ফোরামে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন??

usama alhindi

Member

১১-০২-২০১৮

১ : কোন মুজাহিদ ভাই কোন কাফেরকে হত্যা করে পালানোর সময় কোন (চাই আলেম, সাধারণ যে কোন ধরনের এক বা একাধিক) ব্যক্তি ধরার চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে কি হত্যা করতে পারবে??

২ : কোন ভাই হিজরতের জন্য টাকা জমা করতে লাগলো এমতঅবস্থায় তার জাকাতের নেসাব পরিমান মাল হয়ে গেল তাহলে কি তার উপর জাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে? পরে যদি এই ভাই যেতে না পারেন তাহলে কি করবেন??

৩ : হলি আর্টিজেনের আক্রমন কিভাবে বৈধ হলো??

৪ : বর্তমান যে সমস্ত আলেমগন স্পষ্ট কুফুরিতে লিপ্ত কিন্তু তাদেরকে আমরা বিভিন্ন তাবিলের কারণে কাফের বলছি না কিন্তু সে হাকিকতান কুফুরী করছে (যেমন শাইখ হারেস আননাজ্জারি তার কিতাব কালিমাতুত তাওহীদে পরকালে মুক্তির জন্য ৭ টি সর্ত উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে সাত নাম্বার টি হচ্ছে **المحبة**) তাহলে কি সে আল্লাহর সামনে কাফের হিসেবে উপস্থিত হবে নাকি মুসলিম হিসেবে??

৫ : **العذربالجهل** বর্তমান গ্রহণ করা হবে কিনা??

উপরের বিষয়গুলো দলিল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার মেহনতকে কবুল করুন আমীন।

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৪-২০১৮

১ : কোন মুজাহিদ ভাই কোন কাফেরকে হত্যা করে পালানোর সময় কোন (চাই আলেম, সাধারণ যে কোন ধরনের এক বা একাধিক) ব্যক্তি ধরার চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে কি হত্যা করতে পারবে??

উত্তর: হত্যা না করে পালানোর চেষ্টা করবে। যদি জখম করে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হয়, তাহলে হত্যায় যাবে না। একান্ত যদি হত্যা ছাড়া উপায় না থাকে, তাহলে জীবন বাঁচানোর সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে হত্যা করতে পারবে। [যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে] শিরোনামের পোস্টগুলো পড়লে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

২ : কোন ভাই হিজরতের জন্য টাকা জমা করতে লাগলো এমতাবস্থায় তার জাকাতের নেসাব পরিমান মাল হয়ে গেল তাহলে কি তার উপর জাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে? পরে যদি এই ভাই যেতে না পারেন তাহলে কি করবেন??

উত্তর: নেসাব পরিমাণ হয়ে গেলে এবং যাকাতের শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত দিতে হবে।

৩ : হলি আর্টিজেনের আক্রমন কিভাবে বৈধ হলো??

প্রশ্নটা একটু বুঝিয়ে করুন।

৪ : বর্তমান যে সমস্ত আলেমগন স্পষ্ট কুফুরিতে লিপ্ত কিন্তু তাদেরকে আমরা বিভিন্ন তাবিলের কারণে কাফের বলছি না কিন্তু সে হাকিকতান কুফুরী করছে (যেমন শাইখ হারেস আননাজ্জারি তার কিতাব কালিমাতুত তাওহীদে পরকালে মুক্তির জন্য ৭ টি সর্ত উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে সাত নাম্বার টি হচ্ছে المحبة) তাহলে কি সে আল্লাহর সামনে কাফের হিসেবে উপস্থিত হবে নাকি মুসলিম হিসেবে??

উত্তর: আমাদের দেশের আলেমগণের অনেকে বিভিন্ন প্রকার গোমরাহি ও বিদআতে লিপ্ত হলেও, কুফরে লিপ্ত অনেক কম। অনেকে তাগুতদের বিষয়াশয়

বুঝে না। বুঝিয়ে দিলে তখন বুঝে। এ জন্য আলেমদের তাকফিরের পেছনে না পড়াই ভাল। তাকফিরের বিষয় অনেক জটিল। এক জন মুসলমানকে দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত ঘোষণা দিতে অনেক কিছুর প্রয়োজন। আমাদের উচিৎ তাগুতদের বিরুদ্ধে কাজ করা। আলেম উলামাদেরকে দলীল প্রমাণ দিয়ে বুঝানো এবং তাদের ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরা।

আর যাদেরকে আমরা তাবিলের কারণে তাকফির করি না, তাদের মাঝে স্বাভাবিক এটাই যে, তারা আখেরাতেও কাফের হবে না। তবে কারো অন্তরে যদি নিফাকে আকবার থাকে, তাহলে সে মুনাফিক। কাফের। তবে আমরা যেহেতু অন্তরের খবর জানি না, তাই কে মুনাফিক তা জানাও সম্ভব নয়। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে।

৫ : **العذر بالجهل** বর্তমান গ্রহণ করা হবে কিনা??

العذر بالجهل সব সময়ই গ্রহণযোগ্য। বিশেষত বর্তমানে যখন কুফর শিরিকের ছড়াছড়ি, তখন **العذر بالجهل** এর বিষয়টা মাথায় রাখা জরুরী। তবে ব্যক্তি, বিষয় ও পরিবেশ হিসেবে বিধানে ভিন্নতা আসবে। সবার ক্ষেত্রে সব ধরণের জাহালত গ্রহণযোগ্য নয়। কারো ক্ষেত্রে একটা গ্রহণযোগ্য হবে, আরেকজনের ক্ষেত্রে আরেকটা। তবে শাসকরা কিছুতেই জাহেল নয়। দীর্ঘ যামানা পর্যন্ত তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। তাকফির করা হচ্ছে। তারা এ দিকে ফিরেই তাকায় না। উল্টো আল্লাহর শরীয়ত ধ্বংসে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহর ক্ষেত্রে তাদের জাহালত নেই।

ফানা ফিল্লাহ

Member

১১-০২-২০১৮

ভাই!

আমারও একটা উত্তর দিলে ভাল উপকৃত হতাম।

প্রশ্নটা হলঃ কোন মুজাহিদ যদি বন্দি হয়, আর সীমাতিক্রম নির্যাতনের স্বীকার হয়,তাহলে কি তার জন্য আত্মহত্যা জায়েয হবে?

এটা নিয়ে অনেক ভুগান্তিতে আছি ভাই ।জানালে ভাল হত...

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৪-২০১৮

নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা জায়েয নয়। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সবর করে থাকবে। আপনি নিচের মাকালাটি দেখতে পারেন, সম্ভ্রমহানির ভয়ে আত্মহত্যা বৈধ নয়

প্রশ্ন:-

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!

আমার জানার বিষয় হল- কাফেরদের নির্যাতনের ভয়ে বা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কোনো মুসলিম মহিলার জন্য আত্মহত্যা করা বৈধ হবে কি?

উত্তর:-

ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। নির্যাতনের ভয়ে বা নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যও আত্মহত্যা করা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।" (নিসা- ২৯)

এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞায় অন্য মুসলিমকে হত্যা করা এবং নিজেকে হত্যা করা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ রাগ, মান-অভিমান, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, শাস্তি বা মানহানি ইত্যাদির ভয়ে আত্মহত্যাও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এসবের কোন অবস্থাতেই আত্মহত্যা জায়েয হবে না।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে শায়খ সা'দী রহ. বলেন,

ولا تقتلوا أنفسكم} أي: لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه. اهـ

"তোমাদের পরস্পর যেন একে অপরকে হত্যা না কর এবং কোনো ব্যক্তি যেনো নিজেকে নিজে হত্যা না করে।" (তাফসীরে সা'দী: ১৭৫)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

وأجمع أهل التأويل علي أن المراد بهذه الاية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا . ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه... ويحتمل أن يقال: {ولا تقتلوا أنفسكم} في حال ضجر أو غضب فهذا كله يتناوله النهي. اهـ

"মুফাসসিরিনে কেরাম একমত যে, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য- মানুষের একে অপরকে হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। আয়াতের শব্দ আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞাকেও শামিল করে।... এও অবকাশ আছে যে, অসন্তোষ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তোমরা আত্মহত্যা করো না। এ সবই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।" (তাফসীরে কুরতুবী; খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৩৫)

শায়খ আবু উসামা আশশামী বলেন,

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقتل نفسها حتى لو تعرضت لتدنيس عرضها على يد أعداء الدين مهما بلغت مرارة الألم الذي تشعر به وهي لا شك عظيمة ولكنها لا تبيح لها قتل نفسها لأن الله سبحانه قال " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " فهذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة بحاجة إلى مخصص له لإباحة قتل النفس في مثل هذه الحالة أو غيرها؛ وذلك لا يكون إلا بمصلحة قطعية كلية ضرورية كما في العمليات الاستشهادية بضوابطها الشرعية المعروفة، وقتل المرأة نفسها لأجل أنها تعرضت لما تعرضت له ليس فيه أي مصلحة حتى يقال بجوازه. ومعلوم أن أمثال هذه المرأة مكره والمكره معذور مرفوع عنه الحرج والمؤاخذة، فما الداعي إذن لأن تقتل هذه المرأة نفسها. اهـ

“কষ্ট যতই হোক না কেন, দ্বীনের দুশমনদের হাতে কোন মুসলিম নারী সম্ভ্রমহানির শিকার হলে তার জন্য আত্মহত্যা জায়েয হবে না। যদিও তা অনেক বড় বেদনাদায়ক যন্ত্রণা, তথাপি তা আত্মহত্যার বৈধতা দেবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু’। এ নস কাত্বঈয়্যুস সুবূত ও কাত্বঈয়্যুদ দালালাহ্। এ ধরনের বা অন্য কোন পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার বৈধতা দিতে হলে এ নসের কোন মুখাসসিস (**مخصص**) –তথা বিশেষ পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার বৈধতার স্বপক্ষে বিশেষ দলীল- আবশ্যক। আর তা একান্ত অপারগ অবস্থায় ব্যাপক ও অবশ্যম্ভাবী মাসলাহাত ছাড়া হবে না। যেমনটা শরয়ী নিয়মনীতির অধীনে - যেগুলো সকলেরই জানা- সম্পন্ন ইস্তিশহাদি হামলার ক্ষেত্রে হয়। মসিবতের শিকার হয়ে কোন নারী নিজেকে হত্যা করে দেয়ার মাঝে এমন কোন মাসলাহাত নেই, যার ভিত্তিতে তা জায়েয বলা যেতে পারে। সকলের জানা যে, এ ধরনের মহিলা ‘মুকরাহ’ তথা বাধ্য। এমন ব্যক্তি (শরীয়তের দৃষ্টিতে) মা’জূর। তার কোন গুনাহ নেই। একারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং সে আত্মহত্যা করবে কেন?” (আস-ইলাতু মুনতাদাল মিম্বার, প্রশ্ন নং ৫৮৮)

এক হাদীসে এসেছে,

عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور)صحيح البخاري 6871

“হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ: আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, কাউকে বা নিজেকে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।” (সহীহ বুখারী: ৬৮৭১)

অন্য হাদীসে এসেছে,

عن أبي هريرة ﷺ : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) (صحيح البخاري 5442، صحيح مسلم 313(

“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পাহাড় হতে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে সর্বদা পাহাড় হতে পড়তে থাকবে। এভাবেই সে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে দেওয়া হবে। সে জাহান্নামের আগুনে সর্বদা তা পান করতে থাকবে। এভাবেই সে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ধারালো কোন অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই অস্ত্র ধরিয়ে দেয়া হবে। সে তা দ্বারা জাহান্নামের আগুনে সর্বদা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। এভাবেই সে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।” (সহীহ বুখারী: ৫৪৪২, সহীহ মুসলিম: ৩১৩)

খায়বার যুদ্ধে মুসলিম দাবিদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সে জাহান্নামী’। পরে দেখা গেল সে কাফেরদের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজের পেটে নিজে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করে। (সহীহ বুখারী: ৬৬০৬, সহীহ মুসলিম: ৩১৯ (

সুতরাং আল্লাহ না করুন, কোনো মুসলিম নারী যদি নির্যাতন বা ইজ্জত-আব্রুর উপর হামলার শিকার হন, তাহলে তিনি আক্রমণকারীকে তার সম্ভ্রমহানির সুযোগ দেবেন না; বরং যথাসাধ্য মোকাবালা করে যাবেন। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করবেন। কোনো অবস্থায়ই নিজে আত্মহত্যা করবেন না। যদি তিনি আক্রমণকারীকে হত্যা করতে সক্ষম হন, তবে তিনি ফরজ আদায়ের সওয়াব পাবেন। আক্রমণকারী থেকে নিজের ইজ্জত আব্রু রক্ষা করা ফরজ। যদি আক্রমণকারী তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তিনি ইনশাআল্লাহ শহীদদের কাতারে শামীল হবেন। আর যদি সর্বাত্মক চেষ্টার পরও তিনি নিজের ইজ্জত রক্ষায় অক্ষম হন, তবে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মনে করে সবর করবেন। এজন্য তার কোনো গোনাহ হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার কাছে অবশ্যই তিনি এর মহা প্রতিদান পাবেন।

মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবি রহ. বলেন,

بچّوں اور عورتوں کو خود قتل کرنا جائز نہیں، عورتوں پر خودکشی بھی حرام ہے، منجانب اللہ پیش – آنے والے ہر قسم کے حالات پر صبر کرنا اور دین پر قائم رہنا ان کے لئے بہت بڑا جہاد ہے

"(সম্ভ্রমহানির ভয়ে) মুজাহিদদের জন্য যেমন তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করা হারাম, তেমনি এ অবস্থায় নারীদের জন্যও আত্মহত্যা করা হারাম। আল্লাহর পক্ষ হতে আসা সকল পরিস্থিতির উপর ধৈর্যধারণ করা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকা তাদের জন্য অনেক বড় জিহাদ।" (আহসানুল ফাতওয়া; খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২২)

শায়খ আবুল মুনযির আশশানকিতি রহ. বলেন,

الخوف على العرض لا يبيح قتل النفس بل الواجب على الأخت المجاهدة حفظها الله من كل سوء أن تدفع عن عرضها بكل ما يسر الله من وسائل مشروعة فإن وقع شيء مما تخافه فينبغي الصبر والاحتساب والرضى بما كتب الله من البلاء. ففي الصبر على ذالك الأجر والمثوبة إن شاء الله والدنيا زائلة والأجر باق بإذن الله. اهـ

"সম্ভ্রমহানির ভয় আত্মহত্যার বৈধতা দেয় না। বরং একজন মুজাহিদ বোনের কর্তব্য হল -আল্লাহ তাকে সব রকমের মন্দ থেকে হেফাজত করুন- সামর্থ্যানুযায়ী

শরীয়তসম্মত সকল পন্থায় নিজের সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করা। তবে যে ভয় সে করছিল, তার কোন কিছু যদি ঘটেই যায়, তাহলে তার করণীয় হবে- সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তাআলা তাকদিরে যে মসিবত লিখে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। ইনশাআল্লাহ এই সবরের বিনিময়ে সওয়াব ও প্রতিদান মিলবে। বিইযনিল্লাহ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু সওয়াব রয়ে যাবে।" (আস-ইলাতু মুনতাদাল মিম্বার, প্রশ্ন নং ৩৮৬৯)

والله تعالى أعلم

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৫৮

তাকফির বিষয়ক প্রশ্ন:-

ALQALAM

Senior Member

০২-১৩-২০১৮

বিসমিল্লাহিররাহমানিররাহিম।।
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ মাতুল্লাহ।।

প্রিয় ভাই.!! আজ এক লা মাজহাবি ভাই আমাকে বললো,, যে যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে সালাত তরক করে,, তারা কাফের।।

১/এ কথাটা কি? ঠিক..!

দলীলের প্রয়োজন...!

২/যদি ঠিক না হয়,, ভাই!! তাও দলীলের প্রয়োজন...!!

দয়া করে ভাই জানান....

উত্তর

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০২-১৪-২০১৮

নামায তরক করা কুফর বলে হাদিসে এসেছে। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণিত যে, তারা নামায তরক করাকে কুফর মনে করতেন। তবে শরীয়তের অন্যান্য দলীল থেকে নামায তরক করা কুফর হওয়া সুস্পষ্ট নয়। মোটকথা উভয় দিকেই দলীল আছে। এ কারণে এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে। চার মাযহাবের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাযহাব হলো, নামায তরক

করা কুফর। অন্যান্য মাযহাবে নামায তরক কুফর নয়। তবে তরককারীকে নামায পড়তে বাধ্য করা হবে। প্রহার করা হবে। বন্দী করা হবে। দীর্ঘ দিন জেলে আটকে রেখে শাস্তি দেয়া হবে। যদি এতেও সে নামায পড়তে অস্বীকার করে তাহলে মালেকী মাযহাব মতে হত্যা করে দেয়া হবে। তবে এ হত্যা হদরূপে; মুরতাদ হিসেবে নয়। আর আমাদের হানাফি মাযহাব মতে হত্যা করা হবে না। তবে যতদিন তাওবা করে নামায পড়তে রাজি না হবে ততদিন জেলে আটকে রেখে শাস্তি দেয়া হবে।

হাম্বলী মাযহাব মতেও নামায না পড়লে যে কাফের হয়ে যায়, সেটা নিঃশর্তভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য নয়। বরং এ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে নামায পড়তে অস্বীকার করার কারণে ইমামুল মুসলিমীন তাকে গ্রেফতার করে জেলে ভরেছে। শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই তাকে নামায পড়তে রাজি করানো যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে হত্যা করে দিতে হবে। আর ইমাম মালেক ও অন্য ইমামগণের মতে কাফের হবে না। তবে ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাকে হদরূপে হত্যা করে দিতে হবে, যেমন বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে হত্যা করতে হয়। আর হানাফি ইমামগণের মতে, হত্যা করা হবে না, তবে যতদিন নামায পড়তে রাজি না হবে ততদিন জেলে আটকে রেখে শাস্তি দেয়া হবে।

এ হলো এ মাসআলাতে চারমাযহাবে সারকথা। তো দেখা যাচ্ছে, হাম্বলী মাযহাব মতে নামায না পড়লে যে কাফের হয়ে যায়, সেটা ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়। বরং ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাকে ইমামুল মুসলিমীন গ্রেফতার করে জেলে ভরে শাস্তি দিয়েও নামায পড়াতে রাজি করাতে পারছেন না। আর সুস্পষ্ট যে, বর্তমানে ইমামুল মুসলিমীনও নেই, আর অল্প দু'চার ভূখণ্ড ছাড়া ইসলামী শাসনও নেই। কাজেই ব্যাপকভাবে মুসলমানরা নামায না পড়ার কারণে কাফের হয়ে যাবে- এ কথাটা কোনভাবেই সহীহ নয়। যদি ইসলামী শাসন থাকতো, তাহলে দু'চার ব্যক্তি ছাড়া সকলেই নামায পড়তো। অধিকন্তু সমাজের বিকৃতির কারণে, পরিবেশের বৈরিতার কারণে নামায তরক করাটা একটা সাধরণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তাই, বর্তমান অবস্থায় নামায তরক করাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীন ও খেলাফতের যামানায় নামায তরক করার সাথে মিলিয়ে উভয়ের উপর একই বিধান (তথা কুফরের বিধান) আরোপ করা

কিছুতেই সমীচিন নয়। যেসকল ইমাম নামায তরক করাকে কুফর মনে করেন, স্বয়ং তাদের মাযহাব মতেও এ বক্তব্য সহীহ নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কোন মুসলমান নামায তরক করতো না। মুনাফিকরাই কেবল নামাযে শিথিলতা করতো। তাই তখন কোন ব্যক্তি ইসলামের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও নামায না পড়া সে মুনাফিক হওয়ার দলীল হতো। কিন্তু পরবর্তীতে অবস্থাটা এমন থাকেনি। আস্তে আস্তে নামাযের ব্যাপারে শিথিলতা চলে এসেছে। তাই বর্তমান অবস্থাকে ঐ অবস্থার সাথে মিলানো ঠিক হবে না। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম।

ব্যস্ততার কারণে সংক্ষিপ্তাকারে জওয়াব দিলাম। যদি বিস্তারিত জানার দরকার পড়ে তাহলে জানাতে পারেন। তখন সময় সুযোগ হলে দলীলভিত্তিক আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৯৪৭

নিম্নোক্ত লোকদের কি তাকফীর করা যাবে??

fg২৪৬৪৮৮৫

Junior Member

০৩-৩০-২০১৮

আস-সালামু-'আলাইকুম,
সংসদ সদস্য, মেয়র, চেয়ারম্যান, মেম্বার ইত্যাদি লোকদের কি কাফের/মুরতাদ আখ্যায়িত করা যাবে??? আর যদি কাফের/মুরতাদ আখ্যায়িত করা যায়, তাহলে সেটা কি সমষ্টিগতভাবে নাকি ব্যক্তিবিশেষে তাকফীর করবো???

জাযাকাল্লাহ খায়ের।

উত্তর

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-০১-২০১৮

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যাদের হাতে, তাদেরকে তাকফির করা হবে। বাকিদেরকে নয়। চেয়ারম্যান-মেম্বারের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। সাধারণত মেয়রও এমনই। তাই ভিন্ন কোন কুফর না পাওয়া গেলে তাদের তাকফির করা হবে না।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মূলত সংসদ সদস্যদের হাতে। তাই তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত। এদের প্রতিটি সদস্যই কাফের। তবে ইসলামের নামে যারা গণতন্ত্র করে (যেমন- চরমোনাই) তারা যদিও কুফরে আকবারে লিপ্ত, কিন্তু তাদের তাবিলের কারণে আমারা তাদের তাকফির করবো না।

তবে মনে রাখতে হবে- তাদের তাকফির না করার অর্থ এই নয় যে, তাদের কাজটা কুফর নয়। তাদের কাজ অবশ্যই কুফরে আকবার। কিন্তু তাবিল নামের একটা

মানেয়ে তাকফির পাওয়া যাওয়ার কারণে তাদের উপর মুরতাদের হুকুম লাগানো যাচ্ছে না। অর্থাৎ তাদের কাজটা কুফর (কুফরে মুতলাক্ব), কিন্তু তাদের সকল সদস্যকে কাফের বলা (তথা তাকফিরে মুয়াইয়ান করা) যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে মিম্বারুত তাওহিদের নিম্নোক্ত দু'টি সুওয়াল-জওয়াব দেখতে পারেন (সম্ভব হলে কোন ভাই অনুবাদ করে দিতে পারেন):

ما حكم نواب المجلس التشريعي الحمساوي و أفراد الحكومة ؟

رقم السؤال: 953 القسم : العقيده

تاريخ النشر: 16 /12/ 2009 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..شيخنا الفاضل:

هل نواب المجلس التشريعي الحمساوي والوزراء مرتدون كفار بأعيانهم؟؟ المبدلين لشرع الله ؟ المتلبسين والواقعين في الشرك الأكبر , كما قرأنا لأئمة الدعوة النجدية أنهم لا يعذرون بالجهل في الشرك الأكبر فهل يكونوا كفار أم لا؟؟

هل أفراد الحكومة مرتدون أم أنهم يعذرون بجهلهم؟؟ بارك الله فيكم.

السائل: سلفي جهادي

* * *

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد..

بداية: لا فرق بين نواب حماس أو نواب فتح أو النواب المستقلين أو نواب أدعياء السلفية أو غيرهم في هذا الباب، مادامت حقيقة النيابة واحدة، وهي :التشريع وفقا لدين الديمقراطية، والتحاكم إلى القوانين الوضعية، والقسم على احترامها، والولاء لها قبل الشروع في الوظيفة التشريعية؛ فالعضو نتيجة لهذا القسم يحترم جميع التشريعات الكفرية التي ستشرعها وتقرها الأكثرية، حتى ولو لم يشارك في تشريعها، أو يوافق عليها؛ لأنه أقسم على ذلك، وهذه حقيقة دين الديمقراطية (حاكمية الجماهير).

فهذا الأمر يجب أن يكون واضحًا عند الجميع؛ فمن ارتكب الكفر أو الشرك يكفر سواء أكان من حزب إسلامي أو حزب عَلماني أو حزب إلحادي.

ثانيًا: نواب ووزراء حكومة حماس أو غيرها من الحكومات التي تشرع التشريعات الكفرية، وتحكم بغير ما أنزل الله مرتدون بأعيانهم؛ لأنهم ارتكبوا الشرك الأكبر بممارستهم خاصية التشريع التي هي لله وحده، لهذا فهم لا يُعذرون إلا بالإكراه، وهو غير متحقق؛ لأنهم دخلوا المجالس الشركية باختيارهم.

ثالثًا: جيوش الحكومات الطاغوتية - بما فيهم حكومة حماس - وشرطتها وجميع أجهزتها الأمنية هم مرتدون بأعيانهم؛ لأنهم هم الذين ينصرون الطواغيت، ويتولونهم، ويثبّتون أركان حكمهم بغير ما أنزل الله ، وينفذون القوانين الوضعية والدساتير الكفرية، وينصرونها، ويرتكبون غير ذلك من الكفريات الظاهرة، فحكم جند الطاغوت هو حكم الطاغوت نفسه؛ قال تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} [القصص: 8]، وقال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} [الأحزاب: 67]، وقال تعالى : }الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ} [النساء: 76]، ولا يخرج من هذا الحكم إلا من علمنا في حقه مانعا شرعيًّا معتبرًا لا مُتوهمًا.

رابعًا: باقي أفراد الحكومة: كموظفي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأوقاف وغيرها لا يكفرون إلا إذا ارتكبوا كفرًا صراحًا بواحًا..هذا؛ وبالله تعالى التوفيق.

إجابة عضو اللجنة الشرعية

الشيخ أبو الوليد المقدسي

هل نعتبر كل نواب البرلمانات كفار؟

رقم السؤال: 71 القسم : العقيده

تاريخ النشر: 2009/9/28 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم

...

هل نعتبر كل نواب البرلمانات كفار لأنهم مشرعين من دون الله بما في ذلك نواب حماس أو الإخوان المسلمين عموماً ممن لديهم تأويل .أرجو من الشيخ إفادتنا و جزاه الله خيراً.

السائل: الليث الليبي

***

الجواب:

أخي السائل بارك الله فيك..

لا بد أن نقرر أولا أمرا متفقا عليه- بين علماء التوحيد والجهاد على الأقل ومن و افقهم من غيرهم- لا يصح الخلاف فيه وهو أن الانتخابات البرلمانية التشريعية

التي يكون فيها النائب مشرعا من دون الله هو شرك وكفر بالله وأن من وقع في شيء من ذلك فقد وقع في الكفر والعياذ بالله

...هذا بالنسبة لكفر الفعل أو التكفير المطلق أما تكفير المعين على الإطلاق فهو مما اختلفت فيه الأنظار والاختلاف في ذلك يرجع إلى الاختلاف في فهم قاعدة العذر بالجهل والتأويل ومدى تطبيقهاوتحقيق المناط في المعين من وجود الوصف المكفروتو افر الشروطو انتفاء المو انع ...وهذا الاختلاف في تكفير المعين هو فيمن كان كحال الذين ذكرتهم من اعتمادهم على التأويل فهو وإن كان تأويلا فاسدا باتفاق إلا أن الخلاف في اعتبار هذا التأويل مانعا من مو انع التكفير من عدمه... وإن كان الخلاف في تكفير المعين مما لا يضلل لأجله الإنسان فالذي قد يكفره عالم أو طالب علم لأنه تو افرت عنده في حقه شروط التكفير و انتفت مو انعه قد لا يكفره آخر لأنه يعتقد بوجود مانع من مو انع التكفير في حقه... و أنصحك أخي السائل بالرجوع إلى أول فصول كتاب "الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير" للشيخ أبي محمد المقدسي حفظه اللهوالتي تكلم فيها عن مو انع التكفيروإلى جو ابه عن فتوى حول حكم الشيخين عباس مدني وعلي بلحاج عندما نزلا إلى الانتخابات النيابية في الجز ائر فهي مهمة في هذا الباب، وكذلك إلى رسالة الشيخ أبي قتادة فك الله أسره الموسومة بعنوان" أهل القبلة والمتأولون " فهي مهمة أيضا ...والله الموفق

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৪২৪

সূরা আনফালের ৬৫-৬৬ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই

fg২৪৬৪৮৮৫

Junior Member

০৩-৩০-২০১৮

ভাইয়েরা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটা জানা দরকার। সূরা আনফালের ৬৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65

“হে নবী! ঈমানদার বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দুইশ’ জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তাদের মধ্যে একশ’ জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।" (৮:৬৫)

সূরার ৬৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(66)

"আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দুইশ' জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা দুই সহস্রের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।" (৮:৬৬)

এই আয়াতদ্বয় উল্লেখ করে অনেকে বলেন, শত্রু সংখ্যা আমাদের থেকে দ্বিগুনের চেয়েও বেশি। সুতরাং এখন জিহাদ থেকে পলায়ন করাই জায়েজ।

আবার অনেকে বলেন, মুসলিম সৈন্য ১২০০০ হাজারের বেশি হলে এই নীতি প্রযোজ্য না। অথচ এর কোন রেফারেন্স পাইনি। আর যদি এটা সঠিক হয়েও

থাকে, তাহলে ১২০০০ হাজার এর চেয়ে সৈন্য সংখ্যা কম হলে জিহাদ বাদ দিয়ে বসে থাকবো, যেহেতু পলায়ন জায়েজ আছে। এই সংশয়টা নিরসন করা দরকার উপযুক্ত দলিল সহকারে

উত্তর

ইসহাক সাহা

Junior Member

০৪-০৫-২০১৮

সংশয়ঃ শত্রুসংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে তাদের মুকাবিলা বৈধ নয়।

মুফতি জামিল মাহমুদ

এদেশীয় একজন সালাফি আলেম 'ডক্টর সাইফুল্লাহ' আরাকান ইস্যুতে উক্ত ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন "সমান সমান না হলে মুকাবিলা ইসলামে জায়েজ নয়।"(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

অথচ, বদর, উহুদ, মুতা সহ অধিকাংশ যুদ্ধই এই ফতোয়া অনুযায়ী হারাম হওয়ার কথা! (নাউজুবিল্লাহ) মূলত, বিষয়টি হচ্ছে,

"কাফিরদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালানো বৈধ। কিন্তু যদি মুসলিমদের সংখ্যা ১২০০০ এর অধিক হয় তাহলে দ্বিগুণ হলেও পালানো বৈধ নয়।"

অথচ, এই বিষয়টিকে যুদ্ধে শামিলের শর্ত বানিয়ে ফেলা হচ্ছে! কতই না নিকৃষ্ট গোমরাহি। বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ

কিতাব: আল-লুবাব ফিল জামই বাইনাস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব:

যখন কাফেরের সংখ্যা ২ জনের চেয়ে অধিক হয়ে যায়, তখন একজন মুসলিমের জন্য মুমনিদের এমন কোন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া, যেখানে সাহায্য রয়েছে, এটা জায়েয আছে।

কিন্তু যদি পলায়ন করত: এমন সাধারণ মুসলিমদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়, যাদের সাথে সাহায্য নেই, তাহলে এটা আল্লাহ তা'আলার বাণীতে উল্লেখিত ধমকির অন্তর্ভূক্ত-**ومن يولهم يومئذ دبره**"যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।"

অনুরূপ রাসূল সা: বলেছেন:

আমি প্রত্যেক মুসলিমের (আশ্রয় গ্রহণের) জন্য দল স্বরূপ।

অনুরূপ হযরত ওমর রা: এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছলো যে, উবাইদ ইবনে মাসউদ লড়াইয়ের দিন সামনে অগ্রসর হতে হতে নিহত হয়েছেন, কিন্তু পিছু হটেননি, তখন তিনি বললেন:

আল্লাহ আবু উবাইদের প্রতি রহম করুন! তিনি যদি আমার দিকে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, তাহলে তো আমি তার জন্য দলস্বরূপ হতাম। অত:পর যখন আবু উবাইদের সাথীগণ তার নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, আমি আপনাদের (আশ্রয় গ্রহণের) জন্য দল। আর তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন না। এই হুকুমটি আমাদের মতে ততক্ষণ কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজারে না পৌঁছে। কিন্তু যখন মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছবে, তখন তাদের জন্য তাদের দিগুণ থেকেও পলায়ন করা জায়েয হবে না। তবে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে এরূপ জায়েয আছে।

অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতার জন্য এক স্থান থেকে সরে অন্য স্থানে যাওয়া- যেমন সংকীর্ণ স্থান থেকে প্রশস্ত স্থানের দিকে যাওয়া বা প্রশস্ত স্থান থেকে সংকীর্ণ স্থানের দিকে যাওয়া অথবা শত্রুদের জন্য লুকিয়ে থাকা বা এধরনের অন্য কোন কৌশল, যেগুলো মূলত: যুদ্ধ থেকে ভেগে যাওয়া নয়, বরং এগুলো হচ্ছে মুসলিমদের দলের সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য।

অত:পর যখন তাদের সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছবে, তখন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ: বলেন: সৈন্যবাহিনী যখন এই পরিমাণে পৌঁছে, তখন শত্রুদের সংখ্যা যতই হোক, মুসলিমদের জন্য তাদের শত্রুদের থেকে পলায়ন করা কোনভাবেই জায়েয নেই। শত্রুদের সংখ্যা যতই বেড়ে যাক। তিনি আমাদের উলামাদের মাঝে এব্যাপারে কোন ইখতিলাফ উল্লেখ করেননি।

তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত ইমাম যুহরী রহ: এর হাদীসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন। উবায়দুল্লাহ বলেন:

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন: সর্বোত্তম সহচর চার জান। সর্বোত্তম প্রেরিত বাহিনী ৪০০ জন। সর্বোত্তম সৈন্যবাহিনী ৪ হাজার। ১২ হাজারের কোন বাহিনী কখনো সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।

কোন বর্ণনায় আছে, যে দলের সদস্য ১২ হাজারে পৌঁছে, তারা কখনো পরাজিত হয় না, যদি তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

ইমাম ত্বহাবী রহ: বর্ণনা করেন: ইমাম মালেক রহ: কে প্রশ্ন করা হল, যে আল্লাহর বিধান থেকে বের হয়ে গেছে এবং ভিন্ন বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনা করে, আমাদের জন্য কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে পিছিয়ে থাকা জায়েয আছে? তখন তিনি বলেন: যদি তোমার সাথে তোমার মত ১২ হাজার থাকে, তাহলে তোমার জন্য পিছিয়ে থাকা জায়েয নেই। এমনটা না থাকলে তোমার পিছিয়ে থাকা জায়েয আছে। প্রশ্নকারী ছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ:। এই মতটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসার রহ: এর থেকে বর্ণিত মতের অনুরূপ। এক হাজার দু'হাজারের উপর বিজয় লাভ করবে- আবু জাফর আত-তাবারী: হযরত ইকরিমা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী- যদি তোমাদের মধ্য থেকে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকে...- এর ব্যাপারে বলেন:

মুসলমান একজন আর কাফের দশ জন। অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সহজ বা হালকা করে দেন। তাই এখন তাদের উপর এই বিধান করেন যে, তাদের এক জন পূরুষ শত্রুদের দু'জন পূরুষের মোকাবেলায় পলায়ন করতে পারবে না।

ফাতহুল কাদীর- ইমাম শাওকানী:

যখন নাযিল হল- তোমাদের বিশ জন ধৈর্যশীল (তাদের) দু'শ জনের উপর বিজয় লাভ করবে- তখন ফরজ করে দেওয়া হল যে, একজন দশ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না এবং বিশ জন দু'শ জনের থেকে পলায়ন করতে পারবে না। অত:পর নাযিল হয়- এখন আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ করে দিলেন...। তখন ফরজ করা হল, একশ' জন, একশ' জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না। ইমাম সুফিয়ান ইবনে শুবরুমা বলেন: আমি আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারকেও এরূপ মনে করি; যদি দু'জন অন্যায়কারী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই আমর বিল মারুফ করতে হবে, আর যদি তিন জন থাকে তাহলে তার সাথে লড়াই না করারও সুযোগ আছে।

ইমাম বুখারী, নাহ্হাস তদ্বিয় কিতাব নাসিখ এ, ইবনে মারদুয়াহ ও বায়হাকী তদ্বিয় কিতাব সুনানে ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:

যখন নাযিল হল- তোমাদের মধ্য থেকে দশ জন ধৈর্যশীল থাকলে দু'শ জনের উপর বিজয় লাভ করবে- তখন বিষয়টা মুসলিমদের নিকট কঠিন মনে হল, যেহেতু এতে ফরজ করা হয়েছে যে, একজন দশ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না। তখন সহজ করার জন্য আয়াত নাযিল হল- এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে (চাপ) হালকা করে দিলেন।

তিনি আরও বলেন: অত:পর যখন আল্লাহ তাদের উপর সংখ্যার ব্যাপারে সহজ করে দিলেন, তখন তাদের থেকে যতটুকু সহজ করা হল, ততটুকু পরিমাণ তাদের ধৈর্যও কমে গেল।

কিতাব: আইসারুত তাফাসীর-আবু বকর আলজাযায়েরী:

এখান থেকে একথা পাওয়া গেল যে, কোন মুসলিমের জন্য দু'জনের মোকাবেলা থেকে পলায়ন করা জায়েয নেই। তবে যদি শত্রু দু'জনের বেশি হয়, তখন তার জন্য পলায়ন করা জায়েয আছে। এরকামভাবে সংখ্যা যতই হোক। যেমন দশ জনের জন্য বিশ জন থেকে পলায়ন করা হারাম হবে, কিন্তু তাদের জন্য ত্রিশ জন বা চল্লিশ জন থেকে পলায়ন করা জায়েয আছে।

এই বিধানটা হচ্ছে শুধু মাত্র কষ্ট লাঘবের জন্য, অন্যথায় একজন মুমিনের জন্য দশজন বা তার চেয়ে অধিকের সাথে মোকাবেলা করাও জায়েয আছে। যেমন

মূতার দিন তিন হাজার সাহাবী অস্ত্রে সজ্জিত ১ লক্ষ ৫০ হাজার রোম ও আরবের যৌথ সেবানাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন।

আয়াতে بإذن الله আল্লাহর হুকুমে- এর অর্থ হল, তার সাহায্য ও শক্তিতে। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়।

আবু জাফর আত-তাবারী:

হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, লোকদের (ভ্রান্ত) কথা যেন আপনাদেরকে ধোকায় না ফেলে। কারণ আমি অনেক লোককে শুনেছি, তারা বলে, একজন মুসলিমের জন্য তখনই যুদ্ধ করা উচিত হবে, যখন প্রত্যেকের উপর দু'জন করে শত্রু ভাগে পড়ে এবং প্রত্যেক দু'জনের উপর চারজন করে ভাগে পড়ে। তারপর এই অনুপাতে।

তাদের ধারণা হল, কেউ যদি এ সংখ্যায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ সংখ্যায় না পৌঁছবে যে, প্রত্যেকের উপর দু'জন এবং প্রত্যেক দু'জনের উপর চারজন, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করলেও তাদের কোন গুনাহ হবে না।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)] سورة البقرة[٢٠٧ :

"লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ আত্মাকে বিক্রয় করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

(فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ)] سورة النساء[৮৪ :

"তাই তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাক, তোমার উপর তো তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার নেই। আর মুমনিদেরকে উৎসাহিত করতে থাক।"

অতএব এটিও একটি উৎসাহ, যা আল্লাহ সূরা আনফালে তাদের উপর নাযিল করেছেন। তাই আপনি অক্ষম হবেন না। যুদ্ধ করুন। কারণ আল্লাহ যেটা ঘটাতে চান, তা মানুষের মাঝে কার্যকর হবেই।

from: http://darulilm.org/২০১৭/০৯/৩০/enemy...ubt/#more-১২৯৭

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-০৫-২০১৮

এ আয়াতগুলো উপস্থিত যুদ্ধের ময়দানের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমে মুসলমানদের উপর ফরয ছিল- একজন মুসলিম দশটা কাফেরের সাথে লড়াই করে যেতে হবে। দশের বেশি হলে তখন যুদ্ধ ছেড়ে ময়দান ত্যাগ করতে পারবে। পরবর্তীতে লোকজনের হিম্মতের দুর্বলতা দেখে আল্লাহ তাআলা বিধান লঘু করে দেন। পরে বিধান দেন- একজন মুসলিম দুইটা কাফেরের সাথে লড়াই করে যেতে হবে। দুয়ের অধিক হলে তখন ময়দান ছাড়তে পারবে। অবশ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই প্রশংসনীয়।

আর ময়দানে মুসলিম বাহিনী বার হাজারে পৌঁছে গেলে যদি তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন বলে হাদিসে এসেছে। তাই ময়দানে মুসলিম বাহিনী বার হাজার হয়ে গেলে তাদের উপর ফরয হল- ঐক্যবদ্ধ থাকা। ময়দান ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য কাফেরদের সংখ্যা যদি দ্বিগুন হয়ে যায়, তাহলে ময়দান ছাড়তে পারবে। তবে শর্ত হল-

- কৌশলরূপে ছাড়বে। অর্থাৎ অন্য দিক থেকে ঘুরে আবার আসার উদ্দেশ্যে হতে হবে।
- কিংবা অন্য কোন জামাতের সাথে মিলে আবার যুদ্ধে আসার নিয়ত থাকতে হবে।

এ দুই শর্ত ছাড়া তখন ময়দান ছাড়া নিষেধ।

এ মাসআলা একান্তই যুদ্ধের ময়দানের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যথায় কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে একশোগুণ বেশি হলেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জায়েয। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা কাফেরদের শতভাগের একভাগও ছিল না।

দ্বিতীয়ত কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে তখন আর সংখ্যার কোন হিসাব নেই। সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিহত করতে হবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৪২৩

থানা মসজিদে ইমামতি করার হুকুম প্রসঙ্গে

salahuddin aiubi

Senior Member

০৪-১৯-২০১৮

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

সম্মনিত মুফতিয়ানে কেরাম! আপনাদের থেকে একটি মাসআলার উত্তর কামনা করছি।

তা হল থানার ভিতরস্ত মসজিদে ইমামতি করাতে কোন সমস্যা আছে কি না?

যেখানে মসজিদ কমিটির প্রধানরা পুলিশের বড় বড় অফিসার। মসজিদের বেতন সরকারের পক্ষ থেকে আসে। তবে থানার আশপাশের মহল্লা থেকেও হালকা পাতলা নেওয়া হয়। ইমামকে স্বপরিবারে থাকার জন্য সরকারী কোয়াটার দেওয়া হয়। সরকারী বেতনের স্কেল যেভবে নির্দিষ্ট সময়ে সময়ে বাড়ে, সেভাবে ইমামের বেতনও একটা পরিমাণে বাড়ে।

সম্মানিত ভাইয়েরা! আশা করি, উত্তরটি প্রদান করে আমাকে ও সকলকে উপকৃত করবেন। উত্তরটি জরুরী ভিত্তিতে দরকার। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

উত্তর

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-১৯-২০১৮

সমস্যা আছে। যদি ইমাম সাহেব তাগুতদের কোন প্রকার সহায়তা না করেন, তাদের কুফর ও জুলুমে সহযোগী নাও হন- তাহলেও তাগুতদের অধীনে ইমাম বা

মুআযযিন হিসেবে কাজ করা মাকরুহ হবে। আমাদের উচিৎ তাগুতদের থেকে সম্পূর্ণ বারাআত ঘোষণা করা, তাদের বশ্যতা স্বীকার করা নয়।

এ সম্পর্কে মিম্বারুত তাওহিদের একটি সওয়াল ও জওয়াব দিচ্ছি। আশাকরি আপনি আরবি বুঝেন। সেখান থেকে সহজে বুঝতে পারবেন। বিশেষত সংশ্লিষ্ট অংশটুকু মার্ক করে দিচ্ছি।

যদি কোন ভাই সওয়ালটিকে মানসম্মত তরজমা করে আলাদা একটা পোস্ট হিসেবে দিয়ে দেন, তাহলে এই একটা পোস্ট থেকেই অনেকের অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত যত বার কোন কিছু তরজমা করার আবেদন করেছি, কোন বারই কোন ভাই সাড়া দেননি। আল্লাহ মা'লূম- কি আমাদের আরবি বুঝার মতো লোকের অভাব না'কি আমাদের সময় হয় না, না'কি গুরুত্ব বোধ হয় না।

==========

ماحكم العمل كمدرس في مدارس حكومة الطواغيت في العراق ؟

رقم السؤال:92 القسم : العقيده

تاريخ النشر: 6 /2009/10 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم..ما حكم العمل كمدرس في مدارس حكومة الطاغوت في العراق وحكم الانتساب إليها.

السائل: أبو عبيدة السلفي

* * *

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

إعلم أخي السائل وفقنا الله و إياك لما يحب ويرضى، أن حكم العمل في الوظائف الحكومية الطاغوتية سواء أكان ذلك في العراق أو في غيرها من بلاد المسلمين التي علت فيها أحكام الكفر وساد أصحابها . والله المستعان . لا يخرج عن إحدى ثلاثة أحكام: إما أن يكون كفراً وإما أن يكون محرماً وإما أن يكون مكروهاً، كل حكم بحسب تحقيق مناطه، فإذا كانت الوظيفة تتضمن تولياً لتلك الحكومات وأهلها، ومناصرة ومظاهرة لهم ولتشريعاتهم وقوانينهم، سواء كان ذلك بالدعوة إليها أو بالحكم بها أو بالتحاكم إليها عن رضى أو قبول بها فلا شك أن العمل في مثل هذه الوظائف هو كفر بواح وشرك صراح وردة سافرة عن دين الله سبحانه وتعالى، ومن عمل في مثل هذه الوظائف فقد نقض أصل اجتناب الطاغوت الذي لا يصح إسلام أحد إلا بتحقيقه.

وإذا كانت الوظيفة تتضمن إعانة تلك الحكومات الطاغوتية على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل كمثل جباة المكس والضرائب وما يسمى بالجمارك في بعض بلاد المسلمين أو إعانتها على أكل الربا من خلال ما تقدمه من قروض ربوية للتجار والمزارعين وغيرهم بعد التضييق عليهم بحيث يصبحون مجبرين على ذلك، فيكون الموظف كاتباً لتلك المعاملات الربوية أو شاهداً عليها، فإن العمل في مثل هذه الوظائف حرام قطعاً وكبيرة من الكبائر، ومن عمل في مثل هذه الوظائف فإنه لم يحقق كمال الاجتناب الواجب للطاغوت الذي ينقص إيمان المسلم ويضعف بحسب المعصية التي يرتكبها أو يعين عليها . <u>وإما إذا كانت الوظيفة لا تتضمن أحد مناطي الحكمين السابقين أو كلاهما، كأئمة الأوقاف وخطبائهم ومؤذنيهم، وكالمدرسين أو الموظفين في وزارات التربية والتعليم، وموظفي وزارات الصحة وموظفي البلديات وغيرها من الوظائف التي يكون أقل</u>

أحوال العامل فيها أنه مكثر لسواد تلك الحكومات وذليل صاغر تحت وطأتها، فمثل هذه الوظائف - إن لم يتخللها شيء من المعاصي - تندرج تحت الحكم الثالث من الأحكام التي ذكرناها آنفاً وهو الكراهة، والتي لا يكون العامل فيها قد حقق كمال الاجتناب المستحب للطاغوت .

قال شيخنا الوالد أبو محمد المقدسي حفظه الله تعالى ورعاه في المسألة الثانية من رسالته الإشراقة في سؤالات سواقة: فالذي قلناه ونقوله: (أننا نحب للأخ الموحد أن يكون بعيداً عن هذه الحكومات من باب كمال اجتنابه لها، ولا شك أن منهاج حياة كل موحد هو قوله تعالى: {أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} فذلك معنى "لا إله إلا الله"، لكن منه ما هو شرط للإيمان وتركه ناقض للإيمان، كاجتناب عبادة الطاغوت واجتناب التحاكم إليه مختاراً واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفرية أو القسم على احترامها ونحو ذلك، ومنه ما هو من كمال الإيمان وتركه ناقص للإيمان وليس بناقض للإيمان كيسير الركون والمداهنة أو تكثير سواد ظلمهم ونحو ذلك من المعاصي. أ.هـ ، ثم عقب الشيخ في حاشية المسألة بقوله: ولا يفهم من هذا التهوين من شأن هذه المعاصي، فإن فيها ما هو من الكبائر ولكن المراد تمييزها عن المكفرات، ومن كان له قلب يكفيه الوعيد الذي ذكره الله عزوجل في كثير من الآيات كقوله تعالى في الركون اليسير: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا[.

هذا بالنسبة للعمل والانتساب إلى الحكومات الطاغوتية الحاكمة في بلاد المسلمين عامة، وأما العمل في حكومة العراق الطاغوتية والانتساب إليها، والحال كما هو الحال فيها وقد أضرمت نيران الحرب وسعّرت بين عبّاد الصليب وأذنابهم من أهل الشرك والتنديد وبين حماة الإسلام وجنود التوحيد، ودارت رحى المعركة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإذا كان المدرس لا يكفر ولا

يأثم في تدريسه لبعض المواد المباحة كالرياضيات ونحوها مثلا من المواد التي ليس فيها تمجيدا للقوانين والحاكمين بها ، فإنه لا بد آثمٌ إذا كان خاذلا لإخوانه المجاهدين في ظل هذا الإحتلال ؛ تاركاً للجهاد في سبيل الله الذي هو من أهم فروض الأعيان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى) :العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه (.أ.هـ الفتاوى الكبرى

ولذلك فنوصيك أيها الأخ السائل أن تحرص على عدم تفويت الفرصة في أن تكون من جنود دولة العراق الإسلامية التي رفعت لواء التوحيد والجهاد واحرص على أن تكون من العاملين فيها ولأجل نصرتها وفي عدوتها حتى لو لم تستطع إلا تكثير سواد أهلها فلا تتوانى في ذلك، زادنا الله وإياك حرصاً على ما يقربنا إليه ويرضيه عنا. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو النور الفلسطيني

আরবী ফাতওয়াটির অনুবাদ

salahuddin aiubi

Senior Member

০৪-২০-২০১৮

সম্মানিত ভাই! উপরুক্ত ফাতওয়াটি গতকাল অনুবাদ করতে বসেছিলাম। কিন্তু তখনই অন্য একটি ব্যস্ততা এসে যাওয়ার ফলে তা অফ রাখতে হয়েছিল। একারণে একটু দেরি হল। ফাতওয়ার অনুবাদটি নিচে দেওয়া হল:

ইরাকে তাগুতদের সরকারি বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করার বিধান কি?

প্রশ্ন নং ৯২, বিষয়: আকিদা।

প্রকাশকাল: ৬/১০/২০০৯ ইং।

প্রশ্নের বিবরণ:

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। ইরাকের তাগুত সরকারের বিদ্যালয়সমূহে নিয়োগ হওয়া এবং শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করার বিধান কি?

প্রশ্নকারী: আবু উবায়দা আস-সালাফী।

উত্তর:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের যথাযথ অনুসরণ করে তাদের উপর। আম্মাবাদ, প্রশ্নকারী ভাই! আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে সে কাজ করার তাওফিক দান করুন, যা তিনি ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। জেনে রাখুন, তাগুতী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পদে চাকুরী করার বিধান- চাই সেটা ইরাকে হোক বা অন্য কোন মুসলিম দেশে হোক, যেখানে কুফরী বিধি-বিধান বিজয়ী এবং কুফরের কর্তারা নেতৃত্ব দেয়- তা তিনটি বিধানের যেকোন একটির বাইরে হবে না। হয়ত

কুফরী হবে, নয়ত হারাম হবে, নয়ত মাকরূহ হবে। প্রতিটি হুকুম সাব্যস্ত হবে হুকুমের উৎপত্তি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।

তাই যখন চাকুরির মধ্যে তাগুত সরকার ও তার কর্তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের সমর্থন ও সহযোগীতা করা এবং তাদের আইন ও বিধানের সমর্থন ও সহযোগীতা করা পাওয়া যাবে- এটা চাই উক্ত শাসনব্যবস্থার প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে হোক বা তার দ্বারা শাসন পরিচালনা করার মাধ্যমে হোক বা সন্তুষ্টি ও গ্রহণের সাথে তার নিকট বিচার প্রার্থনা করার মাধ্যমে হোক- তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, এধরণের পদে চাকুরী করা প্রকাশ্য কুফর, স্পষ্ট শিরক্ এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে বহুদূরে বের হয়ে যাওয়া। যে এ ধরণের পদসমূহে চাকুরী করবে, সে তাগুতদেরকে বর্জন করার সেই আবশ্যকীয় রুকনটি ভঙ্গ করল, যেটা ব্যতিত কারো ইসলাম গ্রহণই সহীহ হয় না।

আর যখন চাকুরীতে তাগুত সরকারকে মানুষের উপর জুলুম করার ব্যাপারে অথবা অন্যায়ভাবে মানুষের মাল ভক্ষণ করার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে, যেমন ট্যাক্স, টোল বা কোন কোন দেশে যেগুলোকে রাজস্ব বলে নামকরণ করা হয়, তা উসূলকারী হওয়া বা তাগুত সরকারকে সুদ খাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করা, যেমন তাগুতরা জনগণকে প্রথমে সংকীর্ণতায় ফেলে দেওয়ার পর ব্যবসার জন্য বা কৃষির জন্য সুদভিত্তিক যে ঋণ দেয় এবং এর ফলে জনগণ যা নিতে বাধ্য হয়, সেই সমস্ত মুআমালার লেখক বা সাক্ষী হওয়া- এ ধরণের পদে চাকুরী করা অকাট্যভাবে হারাম এবং কবিরাহ গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম কবিরাহ গুনাহ।

যে এ সমস্ত পদে চাকুরী করে, সে তাগুতকে পরিপূর্ণ বর্জন করার সেই ওয়াজিব হুকুমটি পালন করল না, যা উক্ত গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী ঈমানকে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল করে দেয়।

তবে যদি চাকুরীর মধ্যে পুর্বোক্ত দু'টি কারণের কোন কারণ না পাওয়া যায়- যেমন ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ে ইমামতি করা, সেখানকার খতিব হওয়া বা মুআয্যিন হওয়া অথবা শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক বা অন্য কোন কর্মকর্তা হিসা যোগ দেওয়া বা এগুলো ছাড়া অন্যান্য ঐ সকল পদে যোগ দেওয়া, যেগুলোতে চাকুরীকারী ব্যক্তির সর্বনিম্ন অবস্থা হয় এই যে, সে ঐ সরকারের দল ভারিকারী এবং তার পদতলে লাঞ্ছিত ও অবনত থাকে- তাহলে এ ধরণের চাকুরীতে যদি

অন্য কোন গুনাহ না পাওয়া যায়, তবে এটা আমরা মাত্র যে হুকুমগুলো উল্লেখ করলাম তার মধ্যে তৃতীয় নম্বরটি হবে। অর্থাৎ মাকরুহ হবে। অতএব এ ধরণের চাকুরিকারী ব্যক্তি তাগুতকে পরিপূর্ণ বর্জন করার মুস্তাহাব অংশটি বাস্তবায়ন করল না।

আমাদের শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি (হাফিজাহুল্লাহ)তার পুস্তক "আলইশরাকাহ ফি সুওয়ালাতে সাওয়াকা" এর দ্বিতীয় মাসআলায় বলেন, আমরা যেটা বলেছি এবং বলবো, তা হল: আমরা একজন তাওহিদবাদী ভাইয়ের জন্য এটাই চাই যে, তিনি এই তাগুতী শাসনব্যস্থাকে পরিপূর্ণ বর্জন করার জন্য তা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকবেন। কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি তাওহিদবাদীর জীবন পরিচালনার নীতিমালা হল আল্লাহ তা'আলার বাণী-**{أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}** "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত থেকে বেচে থাক।" এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ। কিন্তু এর থেকে (অর্থাৎ তাগুতকে বর্জন করার পর্যায়সমূহ থেকে) কিছু হল ঈমানের জন্য শর্ত, যা পরিত্যাগ করা ঈমানকে ভঙ্গ করে দেয়। যেমন তাগুতদের গোলামদের থেকে দূরে থাকা, ইচ্ছাকৃতভাবে তাগুতদের নিকট বিচার প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকা, তাগুতদের কুফরী আইন ও বিধি-বিধানের প্রহরা দেওয়া বা তাকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারে শপথ করা বা এজাতীয় বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা।

আর কিছু হল ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার অংশ। এগুলো পরিত্যাগ করা ঈমানকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। কিন্তু ঈমানকে ভেঙ্গে দেয় না। যেমন তাগুতের প্রতি কিছুটা নতঝানু হওয়া, শৈথিল্য করা, তাদের জুলুমের ক্ষেত্রে তাদের দল ভারী করা বা এজাতীয় গুনাহগুলো।

অত:পর শায়খ রহ. এই মাসআলার টিকায় লিখেন: এর দ্বারা এ সকল গুনাহগুলোর ভয়াবহতা কম বুঝা উচিত নয়। কারণ এগুলোর মধ্যে কতিপয় আছে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। তবে আমাদের কথার উদ্দেশ্য ছিল, এ সকল গুনাহকে কুফরী কাজ থেকে পৃথক করা। যার গ্রহণকারী অন্তর রয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার এই ধমকি বাণীই যথেষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কাফেরদের প্রতি সামান্য ঝুকে যাওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন-

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

"আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুকে পড়ার উপক্রম হতে। আর তাহলে আমি দুনিয়ায়ও তোমাকে দিগুণ শাস্তি দিতাম এবং মৃত্যুর পরেও দিগুণ। অত: পর আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।"

এ ছিল সাধারণভাবে সকল মুসলিম দেশে বিরাজমান তাগুতী শাসনব্যবস্থায় যোগ দেওয়া বা সেখানে চাকুরী করার ব্যাপারে। এবার আসি ইরাকের তাগুতী শাসনব্যবস্থায় যোগ দেওয়া ও তাতে চাকুরী করার প্রসঙ্গে। সেখানকার অবস্থা তো সকলের জানাশোনা। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আল্লাহর সাথে শরীককারী ক্রুসেডের পূজারী এবং ইসলামের রক্ষক ও তাওহিদের সৈনিকদের মাঝে ঘোরতর লড়াই চলছে। রহমানের বন্ধু আর শয়তানের বন্ধুদের মাঝে যুদ্ধের চাকা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই যদি কিছু বৈধ বিষয় থাকার কারণে সেখানে অধ্যাপনাকারী কাফের সাব্যস্ত নাও হয় বা গুনাহগার নাও হয়,-যেমন ব্যায়াম বা এজাতীয় বিষয়গুলো বা এমন বিষয়াবলী, যেগুলোতে তাগুতী আইন ও তার শাসকদেরকে সম্মান করা হয় না- তথাপিও সে গুনাহগার হবে, যদি এই আগ্রাসনের ছত্রছায়ায় থেকে তার মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেয়, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: যে আগ্রাসী দুশমন দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করে দেয়, ঈমানের পর তাকে দমন করা থেকে বড় ওয়াজিব আর কিছু থাকে না।

একারণে হে প্রশ্নকারী ভাই! আমি আপনাকে উপদেশ দিব, আপনি ইরাকের ইসলামী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না! যারা তাওহিদ ও জিহাদের পতাকা সুউচ্চ করেছে। আপনি তাদের কর্মী, তাদের সাহায্যকারী ও তাদের দলভূক্ত হওয়ার প্রতি আগ্রহি হোন। এমনকি যদি শুধু তাদের দল ভারি করা ব্যতিত আর কিছুই না করতে পারেন, তবে এর মধ্যেও শৈথিল্য করবেন না।

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ঐ সকল বিষেয়ে আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, যা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে এবং আমাদের প্রতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। এ ছিল আমার কথা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাশীল।

ওয়াসাল্লাল্লঅহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদিও ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাঈন।

উত্তর প্রদান করেছেন: আল-লাজনাতুশ শরইয়্যাহ এর সদস্য শায়খ আবুন নুর আল-ফিলিস্তিনী।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৬১০

মুজাহিদদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জাল নোট তৈরির বিধান

প্রশ্ন: জিহাদের সহায়তার জন্য জাল নোট তৈয়ার করা কি জায়েয?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-১০-২০১৮

উত্তর: নোট জাল করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়- চাই তা জিহাদের সহায়তার জন্য হোক বা অন্য কোন কিছুর জন্য হোক; আর্থিক লেনদেন কাফেরদের সাথে হোক বা মুসলমানদের সাথে হোক। কেননা, মুআমালায় প্রতারণা না করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।" (মায়েদা: ১)

এ নির্দেশ কাফের-মুসলিম সকলের ব্যাপারেই এসেছে।

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীও সকলের বেলায় প্রযোজ্য,

من غش فليس منا

"যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। বরং এসব জাল নোট যার হাতে যাবে, তার জন্য দ্বিতীয় বার তা কোন মুআমালায় লাগানো বা দান-সদকা করা হালাল হবে না। কেননা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া হবে এবং তাদের ক্ষতি করা হবে। বরং এসব নোট থেকে বাজার মুক্ত করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি ভেজাল মুদ্রা ভেঙে ফেলতেন। তখন তিন বাইতুল মালের দায়িত্বে ছিলেন।

জাল নোট তৈরির দ্বারা ভেজাল লেনদেনের সৃষ্টি হবে, যার কারণে মুসলমানদের বাজার ও তাদের মুদ্রামান ক্ষতির শিকার হবে। বরং এসব মুদ্রা অন্যদের কাছে

থেকে মুজাহিদদের হাতে পড়লে অনেক সময় স্বয়ং মুজাহিদরাই ক্ষতির শিকার হবে। তাছাড়া মুজাহিদরা যখন মুসলমানদের সাথে এসব মুদ্রার লেনদেন করবে, তখন মুসলমানদের নিকট মুজাহিদদের যে বদনাম হবে, তা তো আছেই। যাহোক, এই হল কথা। আর আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

উত্তর প্রদানে: আবুল ওয়ালিদ আলমাকদিসি
সদস্য: মিম্বারুত তাওহিদ
২৪/১২/২০০৯ ইং

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৭৭৩

হুকুমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তাবলিগ জামাতে বের হওয়া প্রসঙ্গে

Mimbarut Tawhid

Member

০৫-২২-২০১৮

عن جواز الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ للتمويه على الحكومات المحاربة للمنهج السلفي الجهادي ؟

رقم السؤال: 122

تاريخ النشر: 2009/9/28 المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي

نص السؤال:

السلام عليكم...

-1 شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في الخروج مع مشايخ الدعوة والتبليغ
-2هل أنتمي لهذه الجماعة بس مجرد دفع شبهة أمنية عني لأن المنهج السلفي في غزة الحبيبة أصبح شبهة في ظل حكومة حماس ؟وأنا من شباب السلفية الجهادية ومحبهم في الله؟

السائل: أبو حمزة المقدسي

***

الجواب :

أخانا الفاضل :

ما دمت من أتباع المنهج السلفي الجهادي وتفهم دعوة التوحيد والجهاد فالواجب عليك الانحياز إلى إخوانك من أبناء هذا التيار وتكثير سوادهم

ونصرتهم في الدعوة والجهاد وعدم إضاعة جهدك ووقتك وشبابك وعمرك لتستفيد منه وتقطف ثمرته جماعات ليست على المنهج الحق ؛ هذا هو الأصل ..

لكن كما تعلم للضرورات أحكام ، يعني إذا كنت في نازلة وفتنة وبلاء ورأيت أن خروجك مع هذه الجماعة مؤقتا أو تزيبك بزيها ومخاطبتك لبعض أفرادها سيفيد في التمويه على أعدائك ويدفع عنك أذاهم فلا بأس في ذلك دون أن تقر الجماعة التي ستخالطها - مؤقتا بالطبع حتى زوال الحاجة لذلك - دون أن تقرهم على بدعة أو منكر فضلا عن شرك أو نحوه فيما لو وجد عندهم.

أما الانتماء للجماعة المذكورة فلا نختار لك هذا ولا نراه ضرورة .. ونحن نعرف أن هذه الجماعة ليست حزبا أو تنظيما يوجد فيه انتماء رسمي ؛ ولكننا نجيب على تساؤلك الذي ذكرت .. وفقك الله لما فيه نصرة دينك..

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي

হুকুমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তাবলিগ জামাতে বের হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন:

আসসালামু আলাইকুম ...

১. প্রিয় শায়খ, দাওয়াত ও তাবলিগের শায়খদের সাথে তাবলিগে বের হওয়ার কি বিধান?

২. আমি কি এ জামাতের সদস্য হব? (অন্য কিছুর জন্য নয়,) শুধু আমার উপর থেকে নিরাপত্তাগত সন্দেহ দূর করার জন্য? কেননা, প্রিয় গাজাতে সালাফি (জিহাদি) মানহাজ হামাস হুকুমতের কাছে একটা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি একজন সালাফি জিহাদি মানহাজের যুবক এবং তাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি।

-আবু হামযা আলমাকদিসী

উত্তর:

সম্মানিত ভাই! যতদিন আপনি সালাফি জিহাদি মানহাজের অনুসারি আছেন, দাওয়াতুত তাওহিদ ওয়াল জিহাদ বুঝেন- ততদিন আপনার অবশ্য কর্তব্য, আপনার এই ধারার ভাইদের সাথে জুড়া। তাদের দল ভারি করা। দাওয়াত ও জিহাদে তাদের সাহায্য করা। নিজের শ্রম-চেষ্টা, নিজের সময়, যৌবন ও হায়াত এমন পথে নষ্ট না করা; যার দ্বারা সঠিক মানহাজের উপর নেই এমনসব দল এর ফায়েদা লুটে নেবে এবং এর ফল ভোগ করবে। এটাই মূলকথা।

কিন্তু- আপনিও জানেন- জরুরতের মাসআলা ভিন্ন। যদি আপনি বালা-মুসিবত বা কোন পরীক্ষার সম্মুখিন হয়ে থাকেন এবং মনে করেন, সাময়িক সময়ের জন্য এই জামাতের সাথে বের হওয়া বা তাদের বেশ ধরা বা তাদের কতকের সাথে কথা-বার্তা বলার দ্বারা শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া এবং নিজের উপর থেকে শত্রুর অনিষ্ট প্রতিহত করা সম্ভব হবে, তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। তবে শর্ত হল, আপনি যে জামাতের সাথে মিশতে যাচ্ছেন- আর মিশাটা স্বাভাবিক যে, তা প্রয়োজন শেষ হওয়া পর্যন্ত (এর বেশি নয়)- সে জামাতের কোন বিদআত বা কোন মন্দ কিছুতেও সায় দিতে পারবেন না; শিরক বা শিরক জাতীয় কিছু- যদি তা তাদের মাঝে পাওয়া যায়- তাতে সমর্থন দেয়া তো দূরের কথা।

আর উক্ত জামাতের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে কথা হল- আমরা আপনার জন্য এর সমর্থন দেই না, আর এর জরুরত আছে বলেও মনে করি না। আমরা জানি, এ জামাত এমন কোন দল বা তানজীম নয়, যাতে সাংগঠনিক সদস্য হওয়ার সিস্টেম আছে। তবে আপনি যেভাবে প্রশ্ন করেছেন, আমরা সেভাবেই জওয়াব দিচ্ছি। (অর্থাৎ তাবলীগ জামাতে মূলত সদস্য হওয়ার কিছু নেই। তাই সদস্য হওয়া না হওয়ার প্রসঙ্গ উঠারই কথা ছিল না। তবে আপনি যেহেতু সদস্য হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, তাই আমরা এর জওয়াব দিচ্ছি এবং আপনাকে সদস্য হতে নিষেধ করছি। অন্যথায় এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনার দরকার ছিল না। অনুবাদক।) আল্লাহ তাআলা আপনাকে সে পথে চলার তাওফিক দান করুন, যে পথে আপনার দ্বীনের নুসরত হবে।

উত্তর প্রদানে:

শায়খ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসি

সদস্য: মিম্বারুত তাওহিদ

২৮/০৯/২০০৯

বি.দ্র. হকপন্থী মুজাহিদগণ তাগুতদের থেকে বারাআত ঘোষণা করে সালাফে সালেহিনের অনুসৃত পন্থায় জিহাদ করেন বলে অনেকে তাদের মানহাজকে 'সালাফি জিহাদি মানহাজ' বলে থাকেন।

উপরোক্ত ফতোয়া থেকে বুঝা গেল:

- সকলের উচিৎ সালাফে সালেহিনের পন্থায় যারা দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের সাথে যোগ দেয়া।

- এমন কোন দল বা ফেরকায় যোগ দিয়ে নিজের শ্রম-চেষ্টা ও মূল্যবান হায়াত নষ্ট না করা, যারা হকের উপর নেই (যেমন- প্রচলিত তাবলিগ জামাত) ।

- নিয়মিত তাবলিগ জামাতে সময় লাগানো উচিৎ নয়। কেননা, তাবলিগ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই তাদের দল ভারি করা ও তাদের পথে নিজের জীবন নষ্ট করা উচিৎ নয়।

- একান্ত জরুরত দেখা দিলে তখন সাময়িক সময়ের জন্য তাবলিগে যাওয়া যাবে বা তাদের বেশ ধরা যাবে। প্রয়োজন শেষে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে।

- একান্ত জরুরতে সাময়িক সময়ের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্রেও শর্ত হল: তাদের মাঝে বিদ্যমান বিদআত ও মন্দ কাজগুলোর কোনটাকে সমর্থন করা যাবে না। আর কুফর-শিরক দেখা গেলে তাতে সমর্থন দেয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৮৬০

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া জানতে চাই??

৩৬৫

Junior Member

০৬-০৩-২০১৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ,

সম্মানিত ভাইয়েরা তিনটি প্রশ্ন নিয়ে একটু সংশয়ে আছি। কোন ভাই যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, তাহলে উপকৃত হতাম।

১. হাদিসে আছে, শাসক যতক্ষন রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাত কায়েম রাখেন, ততক্ষন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তাহলে কি সৌদি শাষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না???? যদি বিদ্রোহ করা যায়, তাহলে কুরআন-সুন্নাহর কোন দলিল অনুযায়ী করা যাবে???? এবং সালাত কায়েমের হাদিসটির ব্যাখ্যাটা তাহলে কী হবে????

২. কুর'আন-সুন্নাহ মতে, পুরাতন ও বর্তমান জামানার আলোকে, খিলাফাত ঘোষণা করার শর্ত, উপযুক্ত সময়, নিয়ম ও পদ্ধতিটা কি???? এই বিষয়ের উপর কোন বই(বাংলা) থাকলে লিংক দিতে পারেন অথবা কোনো শর্টনোট দিতে পারেন। যদি এই বিষয়ে কোন লিখা না থাকে, তাহলে আমি এই অধম ব্যক্তিটি মনে করি যে এটা এখন সময়ের দাবি, বইগুলো উম্মতের স্বার্থে লিখা। (কোন অডিও-ভিডিও এর লিংক চাচ্ছি না)

৩. যদি কোনো মুসলিম জোরপূর্বক কোনো খলিফাকে হত্যা/অপসারণ করে অথবা বিরাট এলাকা দখল করে নিজেকে খলিফা দাবি করে, তাহলে কি তার আনুগত্য করতে হবে???? আমি বুঝাতে চাচ্ছি জোরপূর্বক (যেমন আব্বাসীয় বা বাদশাহী খিলাফাত) বিষয়টা। আর আনুগত্য করা যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে আবু বকর আল বাগদাদিকেও আনুগত্য করতে হবে?????

জাযাকাল্লাহু খায়ের

উত্তর

ওয়াআলাইকুমুস সালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৬-০৪-২০১৮

প্রশ্ন-১: বিদ্রোহ

মুহাতারাম ভাই, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে কয়েকটি হাদিস এসেছে-

হাদিস-১

دعانا النبي ﷺ فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة في مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَ أَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ). (متفق عليه وهذا لفظ مسلم. رقم الحديث: 1709، تحقيق فؤاد عبد الباقي

"আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তা হলো, আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তবে হাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭০৯, তাহকিক: ফুআদ আব্দুল বাকী

হাদিস-২

وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ عن رسول الله ﷺ قال:"خِيارُ أئمتكم الذين تُحِبُّونَهُمْ ويُحِبُّونَكُمْ، ويُصَلُّون عليكم وتُصَلُّون عليهم. وشِرارُ أئمتكم الذين تُبْغِضُونَهم

ويُبْغِضُونَكم، وتُلْعِنُوْنَهم ويُلْعِنُوْنُكم. قِيلِ يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاةَ) .صحيح مسلم .رقم الحديث:1855 دار المغني.

"আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম রাখে।" মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খিয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০

অন্য হাদিসে এসেছে-

হাদিস-৩

قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: « لا، ما صلوا.«

"তারা আরজ করল, (ওহে আল্লাহর রাসূল) আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না? তিনি উত্তর দেন, 'না, যত দিন তারা নামায আদায় করে'।" মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-উজুবুল ইনকারি আলাল উমারা, হাদীস নং-৪৯০৬

প্রথম হাদিস থেকে স্পষ্ট: কুফরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া গেলে বিদ্রোহ করতে হবে। কুফরে বাওয়াহ পাওয়া যাওয়ার পর আর কোন কিছুই দেখা হবে না যে, নামায কায়েম করে কি করে না। নামায কায়েম করুক না করুক সর্বাবস্থায় বিদ্রোহ করতে হবে।

দ্বিতীয় হাদিস থেকে বুঝা গেল: রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম না করলে বিদ্রোহ করতে হবে। অর্থাৎ তারা যদি ব্যক্তিগতভাবে নামাযীও হয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম না করে, তাহলে বিদ্রোহ করতে হবে।

তৃতীয় হাদিস থেকে বুঝা গেল: যদি নিজেরা নামায পড়া ছেড়ে দেয়, তাহলে বিদ্রোহ করতে হবে। অর্থাৎ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম করেও, কিন্তু নিজেরা নামায পড়ে না- তাহলে বিদ্রোহ করতে হবে।

মোটকথা: নামায না পড়া বা রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম না করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া- এগুলোর কোন একটা পাওয়া গেলেই বিদ্রোহ করতে হবে। স্পষ্ট যে, সৌদি হুকুমত মুরতাদ হুকুমত। তাই তার বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় বিদ্রোহ করতে হবে; চাই তারা নামায কায়েম করুক বা না করুক, নিজেরা নামায পড়ুক বা না পড়ুক।

এ ব্যাপারে আপনি (আলইমামাতুল উজমা) গ্রন্থের ৪৬৭-৪৭১ পৃষ্ঠাগুলো দেখতে পারেন।

প্রশ্ন-২: খিলাফত ঘোষণা

খিলাফত একটা বাস্তবতা। এটা শুধু একটা নাম নয় বা শুধু ঘোষণা দিয়ে দেয়ার নাম নয়। এর জন্য পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। সামর্থ্য না থাকলে ঘোষণা দিয়ে দিলেও সেটা খেলাফত হবে না। সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও ঘোষণা দিয়ে দেয়া বরং উম্মাহর জন্য মুসিবত ডেকে আনবে- যেমনটা আমরা দাওলার বেলায় দেখেছি। তাদের খেলাফত ঘোষণার দ্বারা যে উম্মাহর মাঝে কতটুকু ফিতনা ও রক্তারক্তি হয়েছে তা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়।

এ ব্যাপারে আপনি এগুলো দেখতে পারেন-

১. ইসলামী বসন্ত- শাইখ আইমান আযযাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ।

লিংক: https://dawahilallah.com/showthread....৮%E০%A৬%B০-pdf
এ লিংকে গেলে সবগুলো পর্বের লিংক পাবেন।

২. দ্বীন কায়েম: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা- আবু আনওয়ার আলহিন্দি হাফিযাহুল্লাহ।

লিংক (ডক):

http://s০০০.tinyupload.com/index.php...৯১৯৬৫৫২০২৫৩৯২
কারো কাছে পিডিএফ লিংক থাকলে সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

৩. উস্তাদ আহমাদ নাবিলের লেকচারসমূহ।

লিংক: http://darulilm.org/tag/ustad-ahmad-nabil/

এগুলো দেখলে আশাকরি বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে। আর ভাই, অলসতা করবেন না। মনে রাখবেন, দু'চার পৃষ্ঠা দেখার দ্বারা বা দুয়েকটা বয়ান শুনার দ্বারা যথার্থ ইলম হাসিল হয় না।

প্রশ্ন-৩: জবরদখল

জবরদখল যদিও হারাম, তথাপিও যদি কেউ আগের খলিফাকে অপসারণ বা হত্যা করে বা আগের খলিফার মৃত্যুর পর জোরপূর্বক অস্ত্রবলে মুসলিম বিশ্ব দখল করে নিয়ে খলিফার আসনে বসে যায়, এবং এমনভাবে তার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয় যে, তাকে অপসারণ করতে গেলে অহেতুক রক্তপাত ছাড়া অন্য কোন ফায়েদা হবে না: তাহলে শর্তসাপেক্ষে জরুরত বশত তার আনুগত্য করতে হবে।

শর্ত হল: শরীয়ত কায়েম করতে হবে। যদি শরীয়ত কায়েম করে তাহলে সকল জায়েয বিষয়ে তার আনুগত্য করতে হবে, যেমন একজন নেককার ও বৈধ খলিফার আনুগত্য করতে হয়। আর যদি শরীয়ত কায়েম না করে, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্যের মাপকাঠি শরীয়ত। শরীয়ত কায়েম না করলে বিদ্রোহ করতে হবে। আর শরীয়ত কায়েম করলে সে যদিও জবর দখলের কারণে গুনাহগার হবে, কিন্তু আমাদের জন্য আবশ্যক হবে তার আনুগত্য করা।

তার এ আনুগত্য জরুরতের কারণে। কারণ, যদি তার আনুগত্য না করা হয় তাহলে জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে, হুদুদ-কেসাস কায়েম করা যাবে না, ইসলামী বিশ্বের নিরাপত্তা বহাল থাকবে না, অহেতুক রক্তপাত হবে- ইত্যাদি অনেক ফিতনা দেখে দেবে। এর চেয়ে তার আনুগত্য করে শরীয়ত কায়েম করে চলাই ভাল।

তদ্রূপ, কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম বিশ্বের কোন ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং এমনভাবে তার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয় যে, তাকে অপসারণ করতে গেলে অহেতুক রক্তপাত ছাড়া অন্য কোন ফায়েদা হবে না: তাহলে উপরোক্ত শরীয়ত কায়েমের শর্তে জরুরত বশত উক্ত ভূখণ্ডের লোকজন জায়েয বিষয়াশয়ে তার আনুগত্য করবে। উক্ত ভূখণ্ডের বাহিরের লোকজনকে তার আনুগত্য করতে হবে না।

উল্লেখ্য, আবু বকর বাগদাদি অল্প কিছু ভূখণ্ড দখল করেছিল। সামগ্র মুসলিম বিশ্ব জবর দখল করে খলিফার আসনে বসার স্বপ্ন তার পূরণ হয়নি। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য তার আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার প্রশ্নই হতে পারে না। তবে সে যতটুকু এলাকা দখল করেছে, ততটুকু এলাকার লোকজন জায়েয বিষয়ে তার আনুগত্য করবে। যেমন- আমেরিকা, শীয়া ও গণতান্ত্রিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বা সাধারণ মুসলমানদের হত্যা বা লুণ্টনের ক্ষেত্রে বা অন্য কোন অন্যায়ের ক্ষেত্রে আনুগত্য জায়েয হবে না। অবশ্য বর্তমানে তার দখলদারিত্বে কোন এলাকা আছে বলে জানা নেই। আল্লাহ তাআলা খারেজীসহ সব ধরণের ফেতনা হতে উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমীন।

এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সিয়াসতের কিতাবাদিতে বিদ্যমান। সময়স্বল্পতার কারণে রেফারেন্স উল্লেখ করলাম না। সংক্ষিপ্ত পরিসরে (আলইমামাতুল উজমা) গ্রন্থের ২২০-২২৬ পৃষ্ঠাগুলো দেখতে পারেন। এছাড়াও পূর্বে যে কিতাব ও লেকচারের বরাত দিয়েছি, সেখানে এ ব্যাপারে মোটামুটি আলোচনা আছে।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহীহ বুঝ ও আমলে সালেহের তাওফিক দান করুন এবং সব ধরণের ফিতনা হতে হিফাজত করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৯২৭

বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে চাকরির বিধান জানতে চাই। খুবই জরুরী

আলোর মিনার

Member

০৭-০২-২০১৮

প্রশ্ন:

বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে চাকরির বিধান জানতে চাই।

আশা করি কোন আলেম ভাই বিস্তারিত দলিল সহ মাসআলাটির সমাধান দিবেন। আল্লাহ সহায় হোন।

উত্তর

আবু জাবের

Senior Member

০৭-০৩-২০১৮

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হচ্ছে দলগতভাবে একটি মুরতাদ বাহিনী, যদিও এর ভিতর কোন কোন ফাসিক মুসলমান, এমনকি মুমিনও থাকতে পারে। তবে এই কারণে "এই মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্বক জিহাদের হুকুম" এ কোন পরিবর্তন হবে না।

মুরতাদ বাহিনী

১। এই মুরতাদ বাহিনীকে দলগত তাকফীরঃ

তাকফীর তাইফাতুল কুফর বা কোন দলকে তাকফীর করা - এই বিষয়টিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেননি বরং এটা ঈমান ও কুফরের বিষয়।

এরকম পরিস্থিতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ও এসেছিল যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া একদল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধীতা করেছিল। তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে হত্যা করা হয়, আল কোরআনে এ কাজের প্রশংসা করা হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা অনুমোদন করেন।

এই ব্যাপারে দলিল দেবার পূর্বে আমরা এই ব্যাপারে কিছু মূলনীতি আলোচনা করতে চাই। তা হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। আমরা সকল ভাই-বোনকে এটা জানাতে চাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানের ব্যাপারে দুইটি নিয়ম করেছেন। একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তার ঈমানের অবস্থা; আরেকটি হচ্ছে তার দল কিংবা যে দলের প্রতি তার আনুগত্য ও সমর্থন রয়েছে, যে দলের জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে, সময় ও শ্রম ব্যয় করে সেই দলের ঈমানের অবস্থা সংক্রান্ত।

এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে:

ক) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান: এরা হচ্ছেন ঐ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরুপ: আনসার ও মুহাজির উভয় দলের সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণ। কিংবা ঐসকল মুসলমান যারা এমন কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, যেখানে এমনকি যদিও খলিফা জুলুমকারী হয়, শরীয়ত তখনো পূর্ণাঙ্গ থাকে এবং মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই। এখন এর উদাহরণ হচ্ছে: ঐ সকল মুসলমানগণ যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছেন, সমর্থন করছেন তারাও এই দলে পড়বেন যদিও তারা ঐ দলে শরীক হতে পারছেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَوَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُعَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে করুন।"- সূরা আল বাকারাহ: ২৮৬

খ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের এবং দলগতভাবেও কাফের:

এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আসল কাফের (অর্থাৎ, সে ইসলাম গ্রহন করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেনি, বরং পূর্বের থেকেই সে কাফের, যেমন: ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) ও মুর্তাদ (যারা দ্বীন ইসলাম গ্রহন করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শিরক করার মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেছে) হবার কারণে ইসলামের বাহ্যিক আমলগুলি সম্পাদন করে না। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি কোন কাফের কিংবা মুর্তাদ দলের অনুগত থাকে এবং ঐ দলের পক্ষে কাজ করে।

উদাহরণ স্বরুপ: বর্তমান মুসলমান দেশসমূহে সেনাবাহিনীগুলোতে কর্মরত ইহুদী-খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, অগ্নি উপাসক ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি ইত্যাদি। কারণ মুসলমান দেশের সেনাবাহিনীগুলিও বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের রক্ষক না হয়ে বিরোধীতা করছে – তাই এসব সেনাবাহিনী দলগতভাবে কাফের দল।

গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান:

এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাইরে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করছে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে। এবং সে এমন একটি দলের অংশ যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে। এই ইবাদত-বন্দেগীর কারণ হচ্ছে যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী করতে পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল।

বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছে: মুর্তাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায়। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং এ যোগদান করে।

তাদের স্বরুপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দুরার আস সুন্নিয়া, ৯ম খন্ড,মুর্তাদের ব্যাপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে।

ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফের: এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এটাকে ভালোভাবে না বুঝলে তাকফীরের ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যাবে। খারেজী, তাকফীরী ও মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। এই রকম পরিস্থিতি বা দল নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগেও এরকম দল ছিল যখন রিদ্দাহ এর ঘটনা ঘটেছিল। যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও এইরকম দল ছিল।

সত্যি কথা হলো: বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও তাই। ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরজ-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে তাহাজ্জুদ পালনকারী, হজ্জ্ব আদায়কারী। কিন্তু যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা

করছে, যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বাধাপ্রদান করছে – সে ঐসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত কাফের অথবা মুর্তাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তায়েফের ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, নামাজ পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর পাথর, আগুন ও সাপ-বিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে – যদিও সেখানে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামাজ পড়তো কিংবা ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো। এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় ঐ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করে যারা তখনও হিজরত করেনি। এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়ে সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভয় দেখাতে চেয়েছিল। এসব মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জানিয়েছিলেন যে, "বনী হাসিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে উনাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয় কারণ তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।" একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: "ওহ তাহলে আমরা আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দিবো, তাদেরকে হত্যা করবো না।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়েছিলেন, "তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুখে চড় মারা হোক?" উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ঐ সাহাবীকে শাস্তি দেয়ার অনুমতি চাইলেন।

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসবই পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর ছোঁড়া কিছু কিছু তীর ঐ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মুহাজির ও আনসার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: "আমরা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি।" তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَيَهْتَدُونَ سَبِيلاً

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এই ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" - সূরাহ আন নিসা: ৯৭-৯৮

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু ঐ সকল দুর্বল মুসলমানদেরকে জাহান্নামের শাস্তি মাফ করে দেন যারা দুর্বল ও নিরুপায়। কিন্তু এই ঘটনায় কোন কুফরের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ "আপনার এই যুক্তিটি বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন এবং আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।"

অন্য হাদীসে এসেছে: “আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো। আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন।” (বিস্তারিত: সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল গাযওয়া)

তারপর তিনি আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم

“হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মংগল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” - সূরাহ আল আনফাল: ৭০

অতঃপর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। (বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী)

কুফরের দল এবং ঈমানের দল চেনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” - সূরা আন নিসা: ৭৬

এই আয়াত থেকে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটি নিয়ম পাওয়া যায়:

ক) যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় লড়াই করে, তারা সাধারণভাবে মুমিন যদিও ঐদলে মুনাফিক থাকতে পারে। তারপরও সেটা মুমিনদের দল।

খ) যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোন প্রতিদ্বন্দীর জন্য অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের জন্য লড়াই করে, তারা একটি কুফরের দল যদিও সেই দলে এমন কেউ থাকতে পারে যে কাফের নয়। বাহ্যিকভাবে তাদেরকে যে রকম দেখা যায়, সে হিসাবেই দলীয় ভাবে তাদেরকে কুফরের দল গণ্য করা হবে।

গ) এসব দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, কোন দলকে আমরা সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বাহ্যিক দিক দেখেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং এই যুদ্ধ অবশ্যই চলবে।

তাহলে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, যে উদ্দেশ্যে কোন দল যুদ্ধ করে থাকে, সেই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দলকে কুফরের দল কিংবা ঈমানদারদের দল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কোন দল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তবে তারা ঈমানদারদের দল। যদি তারা তাগুতের জন্য লড়াই করে তবে তারা কুফরের দল। আর ইসলামী শরীয়ত এর পরিবর্তে অন্য যে সকল কিছু বা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় তারাই হল তাগুত। আর সন্দেহাতীতভাবে এই প্রকার তাগুত হচ্ছে কুফরের দল।

এছাড়াও নীচের হাদীসেও একটি দলকে ঈমান ও অন্য দলকে কুফরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "একটি বাহিনী কাবা শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে। তারা যখন বাইদাহতে আসবে তখন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পৃথিবী গিলে ফেলবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কিভাবে পৃথিবী তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে গিলে ফেলবে অথচ সেখানে কেউ কেউ থাকবে বাজারে আরও অনেকে থাকবে যারা ঐ বাহিনীর নয়।" তিনি বললেন: "সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পৃথিবী গিলে

ফেলবে অতঃপর যার যার নিয়্যত অনুযায়ী তারা আখিরাতে উঠবে।" (সহীহ বুখারী)

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

"সেখানে তো অনেকে থাকবে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার যার নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে আখিরাতে উঠানো হবে।" ইমাম নাসায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর বর্ণনায় এসেছে: "যদি তাদের মধ্যে কোন ঈমানদার থাকে তাহলে কি হবে?" এ থেকে বুঝা যায় যে ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল যদিও এর ভিতরে কেউ কেউ ঈমানদার থাকবে।

যদিও ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল কিন্তু এর ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কাফের নাও বলা হতে পারে। এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর সুস্পষ্ট অবস্থান, আর এটাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান।

তাই সেনাবাহিনী হোক কিংবা কোন বিভ্রান্ত দল হোক, যেমন: জাহমিয়া,যে কোন দলের উপর তাকফীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর মূলনীতি এটা নয় যে,তারা কোন দলের সকল ব্যক্তিকে একসাথে ব্যক্তিগতভাবে তাকফীর (তাকফীরুল মুয়াইয়িন) করেন।

এমনও হতে পারে যে, সেখানে কোন নিরুপায় বাধ্যগত মুসলমান আছে অথবা সেখানে সাময়িক অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য কোন ফাসেক মুসলমান আছে।

এমনকি সেই দলে কোন ভালো মুমিনও থাকতে পারে,যে সেই দলের ভিতর লুকিয়ে আছে যাতে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। যেমন: মিশর সেনাবাহিনীতে খালিদ আল ইস্তাম্বুলি (রাহিমাহুল্লাহ) [[উনি ছিলেন মিশরের একজন আলেম শাইখ মুহাম্মাদ ইস্তাম্বুলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাই। মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আহমদ আনওয়ার আস সাদাত এর শাসনামলে মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসিন হন। তার ভাইকে সত্য প্রকাশের জন্য জেলে প্রেরণ করার কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সাদাতকে ৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ তে হত্যা করেন। এই নায়োকোচিত ঘটনাটি টেলিভিশনে একটি সরাসরি অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি

সম্পন্ন করেন, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এখনও হাতের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা যায়। অত:পর ভাই খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তৎকালীন শাসকেরা বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে মুবারকের ক্ষমতায়নের জন্য ঠান্ডা মাথায় খুন করে।]] ছিলেন অথবা ফেরাউনের পরিবারের সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল কোরআনে এসেছে:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَ إِنيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُوَ إِنيَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে বললো, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।" - সূরা আল মুমিন ৪০:২৮

তবে এসব দুই-একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার বিবেচনায় এই দলটির কাফের হবার শরীয়তি সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আসে না। ফেরাউনের পরিবারের দুই/এক জন মূসা (আঃ) কে রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরাউনের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলে দেন নি।

তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা তাগুতের জন্য মুসলমান ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের একটি দল। এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করা উচিত যতক্ষণ না তারা ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে। ছোট কিংবা বড় কোন ব্যাপারেই যাতে এই দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত না নেয়।

যদিও এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা কাফের কিংবা মুর্তাদ বলি না কিন্তু এই দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়,তাদেরকে আমরা তাগুত বলি।

অপরদিকে, আমাদের মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ মুসলমানরা বেশীরভাগই হচ্ছেন দুর্বল ও অসহায় এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়তকে পছন্দ করেন।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা তাকফীরী / খারেজী দলগুলো ভুলে যায় এবং মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ জনগণকে কাফের/ মুশরিক মনে করে। অথচ এই দলগুলোই আবার এসব দেশকে মুর্তাদ সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করার আহবান জানায়। এখন যদি এসব দেশের বেশীরভাগ মানুষ কাফের-মুশরিকই হয়,তাহলে এসব দেশকে মুর্তাদদের হাত থেকে মুক্ত করে লাভ কি? কারণ এসব দেশ মুক্ত করার পর তাদের দৃষ্টিতে এ সকল 'মুর্তাদ'দের (অর্থাৎ, সাধারণ জনগণকে) হত্যা করতে হবে!! এভাবেই অজ্ঞ এবং বোকা মুসলমানদের তারা আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে ধোঁকা দেয় এবং ক্ষমতার প্রলোভন দেখায়।

সুত্রঃ শাইখ আবু হামযা আল মিসরী (আল্লাহ তাঁকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করুন)

২। এই মুরতাদ বাইনীর ব্যাপারে হুকুমঃ

বর্তমান বিশ্বের যেকোন দেশের সেনাবাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের শত্রুদের স্বার্থ রক্ষা করা। এটা হচ্ছে মুসলিম ইতিহাসের মধ্যে অত্যন্ত জঘন্যতম একটি অধ্যায়!

এই সেনাবাহিনীর দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা হয়ঃ

প্রথমতঃ দেশের রাজা অথবা প্রেসিডেন্ট এবং তার সহচরদেরকে রক্ষা করা অর্থাৎ তাগুতের রক্ষাকারী

দ্বিতীয়তঃ এই উম্মতের শত্রু অর্থাৎ ইহুদী এবং আগ্রাসী (আমেরিকার) শক্তির স্বার্থ রক্ষা করা।

সুতরাং যদি কোন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া এই ফরজ আমল দুটি পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও তখন ফরজ হয়ে যায়।

- এই সেনাবাহিনী মুসলিম দেশগুলোতে মুরতাদ শাসকদেরকে রক্ষা করছে।

- এরা ইসলামী শরীয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং

- যারা এই শরীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদেরকে হত্যা করছে।

- তারা আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পাকিস্থান, সোমালিয়া এবং পশ্চিমা বিশ্বের মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

যদি সেনাবাহিনীর অবস্থা এই হয় তবে কেন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ঐ সকল মুজাহিদীনদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে, 'তারা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে'? এটা কোন্ ধরনের বিভ্রান্তকর যুক্তি?

দোষারোপ তো করা উচিত ঐ সকল সেনাবাহিনীদের প্রতি যারা সামান্য বেতনের বিনিময়েঃ

- স্বেচ্ছায় সোয়াতের মুসলিমদের হত্যা করছে,

- বোমা দিয়ে ধ্বংস করছে মসজিদগুলোকে যেমনটি তারা লাল মসজিদের সাথে করেছে

- সোমালিয়াতে মহিলা ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করছে।

ঐ সেনাবাহিনীগুলো নিষ্ঠুর পশুর মত! যারা সামান্য ডলারের বিনিময়ে নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং মানুষরূপী কিছু শয়তানের সামনে তাদের মাথা নত করে আছে। এরাই এই উম্মদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব।

যারা এই সেনাবাহিনীর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের উপর আল্লাহর দয়া ও রহমত বর্ষণ করুন এবং যারা এদের দ্বারা নিহত হচ্ছেন সেই সকল শহীদদের উপর আল্লাহর দয়া ও রহমত দান করুন।

সংগ্রহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০১১৮

কাফেরদেরকে সম্মান ও আচরণের ব্যাপারে

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ঐতিহাসিক ফতোয়া

Ahlos sogor

Senior Member

০৯-১৯-২০১৮

কাফেরদেরকে যে সম্মানিত করবে, মুসলমানদেরকে সে অসম্মানিত করল - মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহি:

মুজাদ্দিদে আলফে সানী তার এক কিতাবে লিখেন :

"আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রিয় আলাহিস সালামকে বলেছেন: হে নাবী সাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম! কাফের এবং মুনাফেকদের সাথে জিহাদ কর। যেখানে নিজের প্রেরিত রাসূল; যিনি মহান আখলাকের অধিকারী অবিধায় ভূষিত, কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে এবং এই ক্ষেত্রে কঠোরতা করার আদেশ দিচ্ছেন। তো এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে কঠোরতা করা উত্তম আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইসলামের সম্মান মানেই কুফুর এবং কাফেরদের ধ্বংশ।

আর যে কাফেরদেরকে সম্মান করল সে মুসলিমদেরকে অপদস্থ করল। কাফেরকে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, তাকে শুধু তাকে সম্মান করবে ও উঁচু স্থানে বসাবে। বরং নিজেদের মাজলিসে তাদেরকে জায়গা দেয়া, ভাল আচরণ করা, কথা-বার্তা বলা সবই কুফফারদেরকে সম্মানে অন্তর্ভুক্ত। কুত্তার (কুকুরের) মত তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে নিজের ও নবীর দুশমান বলেছেন। সুতরাং রাসূলের দুশমানদের সাথে মিলিত হওয়া এবং মহাব্বত করা জঘন্য অপরাধ। আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সাথে দুশমনি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।

হিন্দুস্তানে কুফফারদের উপর থেকে জিজিয়া উঠিয়ে নেয়ার কারণ এটা যে, তারা (মুসলমান) বাদশাহদের সাথে সম্পর্ক করে নিয়েছে। তাদের থেকে জিজিয়া নেয়ার উদ্যেশ্য এটাই যে, তাদের জিল্লতি ও অপদস্থতা। এই অপমান এই পরিমান হবে যে তারা জিজিয়ার মূল্য থেকে ভাল কাপড় না পরতে পারে এবং সম্মান-মর্যাদার সাথে

চলাচল না করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা জিজিয়াকে কুফফারদের অপদস্থতার জন্য দিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের অধঃপতন এবং মুসলমানদের উন্নতি ও বিজয়। আর কুফফারদের সাথে ঘৃনা ও বিদ্বেষ পোষণ করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার আলামত।

(মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী - খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৭)

সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮১১

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন - মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিযাহুল্লাহ)

مصعب بن عمير

Member

১১-০৪-২০১৮

প্রশ্নঃ-

আল্লাহর রাস্তার আম ও খাস কোন অর্থ আছে কি ? আল্লাহ রাস্তা বিষয়ক হাদিসগুলো কি শুধুই জিহাদের জন্য প্রযোজ্য এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হলে যে ফজিলতগুলো বর্নিত হয়েছে এগুলো কি শুধুই জিহাদের জন্য প্রযোজ্য ? আর এই ফজিলত কি তাবলিগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় কি???

উত্তরঃ-

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন — মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিযাহুল্লাহ) শাইখুল হাদীস ও মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ।

জিহাদ কুরআন ও হাদিসের একটি বিশেষ পরিভাষা। তাঁর অর্থ হল দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। শব্দ বিবেচনায় **জিহাদ শব্দটির** দু ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়,

১) جاهد العدو مجاهدة جهادا অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা।

২) جاهد في الامر অর্থাৎ কোন কাজে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। এই অর্থেই বলা হয়ে থাকে মোজাহাদা।

কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়, কোথাও শুধু **جهاد و مجاهدة** এসেছে। কোথাও তার পরে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়) যুক্ত হয়েছে। কোথাও আবার **في الله** (ফি আল্লাহ) ও **فينا** যুক্ত হয়েছে।

এমনকি **سبيل الله** (সাবিলিল্লাহ) শব্দটিও কখনো একাকী ব্যবহার করা হয়েছে কখনো **جهاد** এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে জিহাদের অর্থ বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্যে একটি একটি মূলনীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যা মূলত নুসূসের আলোকে গৃহিত ও অধিক নিরাপদ। এতে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ও অনর্থক ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। যেখানে শুধু **مجاهدة** শব্দ এসেছে কিংবা তারপর **الله في** (ফি আল্লাহ) বা **فينا** এসেছে, সে আয়াতগুলো "আম" (ব্যাপক)। অর্থাৎ সেখানে জিহাদ শব্দটির আভিধানিক যে অর্থে ব্যাপকতা আছে তা উদ্দেশ্য হতে পারবে। যেমন আল্লাহর বাণী — **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه**অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর পথে সর্বশক্তি ব্যয় করো। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮) অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করে'।

অনুরূপ আল্লাহর বাণী — **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين**। অর্থঃ যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদের বহু পথের সন্ধান দেই। (সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৯)

এই আয়াতদ্বয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বীনের সকল প্রচেষ্টাকে শামিল করে। যে কেউ যে কোনো পদ্ধতিতে দ্বীনের জন্য কোন প্রচেষ্টা করবে, সে এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হতে পারবে।

কিন্তু যেখানে জিহাদ শব্দ এসেছে কিংবা **مجاهدة** মূল ধাতুর সাথে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) যুক্ত হয়েছে, অথবা কোথাও শুধু **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) বলা হয়েছে (যেমনটা যাকাতের হক্বদার ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের আলোচনায় এসেছে) — এ সকল আয়াত দ্বারা **جهاد** (জিহাদ) এর খাস (বিশেষ) অর্থ (অর্থাৎ যুদ্ধ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এ কারনেই সূরা তাওবাহর যেখানেই **جهاد** শব্দ এসেছে সেখানেই শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী (রহঃ) এবং তার অনুসরণে শাইখুল হিন্দ (রহঃ) যুদ্ধ করা অর্থ লিখেছেন।

এমনিভাবে হাদিস গ্রন্থগুলোতে **فضائل الجهاد** ও **ابواب الجهاد** নামে যে শিরোনাম গুলো এসেছে সেখানেও এই বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য। আপনি চিন্তা শক্তিকে জাগ্রত রেখে অধ্যায়গুলো পাঠ করুন। দেখবেন **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) এর বর্ননাগুলো যেখানে উল্লেখ আছে, সেখানেই জিহাদ উদ্দেশ্য। এতে বোঝা গেল **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) শব্দটিও ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। কিন্তু শত দুঃখের বিষয় আমাদের তাবলীগী ভায়েরা এই আয়াতগুলোকে "আম" (ব্যাপক) করে দিয়েছেন।

এমনকি শুধু "আম"ই নয় বরং নিজেদের সাথে "খাস" (সীমাবদ্ধ) করে নিয়েছেন। কারন তারা দ্বীনের কাজগুলোর মধ্যে শুধু তাবলীগকেই জিহাদ বলেন। অন্যান্য দ্বীনি কাজ যেমন তা'লীম, তাদরীস, তাফসীর, তা'লিফ ইত্যাদি কিছুকেই জিহাদ বলেন না। বরং তাবলীগের কিছু সাধারণ সাথী ভাই তো এমন আছে, যারা এগুলোকে দ্বীনের কাজই মনে করে না। আর যখন তারা নিজেদের কাজকেই জিহাদ নাম দিয়ে দিয়েছে তখন কুরআন ও হাদিসের জিহাদের যেসব ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তা ঢালাওভাবে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছে। আজ বাধ্য হয়ে শত আক্ষেপের সাথে বলতে হয় তাবলীগী ভাইদের এই কাজগুলো কোনভাবেই সহীহ হচ্ছে না।

জিহাদ ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। কুরআন ও হাদীসে যখন এই শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন এর দ্বারা **قتال في سبيل الله** (ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ) উদ্দেশ্য হয়। তবে হ্যাঁ কিছু কিছু কাজকে জিহাদের সাথে মিলানো হয়েছে। এ মিলানোটুকুই এ কাজগুলোর ফজিলতের জন্য যথেষ্ট।

যেমন হাদীসে আছেঃ

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন যে ইলমের খোঁজার জন্য বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে। এখানে রাসূলুল্ললাহ সাঃ ইলম অন্বেষণের পথকে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) আখ্যা দিয়ে জিহাদের সাথে তুলনা করলেন। এই তুলনা করাটাই তালেবে ইলমের জন্য ফজিলত। এর থেকে আগে বাড়ার কোন অধিকার কারো নেই।

এমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকেও **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) এর সাথে মিলানো যেতে পারে। আর মিলানোটাই তার ফজিলত হবে। কিন্তু তাই বলে জিহাদের সমস্ত ফজিলত তার সাথে প্রয়োগ করা **في سبيل الله جهاد**(জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) কে তাবলীগের সাথে 'খাস' করা বা **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) কে 'আম' করে তাবলীগকেও এর উদ্দেশ্য বানানো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বদা স্মরণ রাখা জরুরী।

মোট কথা এই **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) পরিভাষাটি কুরআন ও হাদীসে 'আম' (ব্যাপক) না 'খাস' (বিশেষ) এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। তবে আলোচনা পর্যালোচনার পরে মাসরাফে যাকাতের (যাকাতের ব্যয়ের খাত) আলোচনায় এই কথাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) একটি বিশেষ পরিভাষা অর্থাৎ 'খাস' এবং সকল মুহাদ্দিসীনের কর্ম পদ্ধতিও এটাই ছিল (অর্থাৎ সকল মুহাদ্দিসীন ফি সাবিলিল্লাহকে কে বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন)। তারা সকলেই **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) শব্দ সম্বলিত সকল হাদীসকে কিতাবুল জিহাদ অর্থাৎ জিহাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তার মানে তাদের নিকটও এটা বিশেষ পরিভাষা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ফযিলতসমূহ একটি বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত।

কিন্তু তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে 'আম' করে ফেলেছেন। বরং তারা নিজেদের কাজকেই ঐ সকল হাদীসের **مصداق** বা প্রয়োগ ক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন।

তারা মেশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের কিতাব থেকে তাবলীগী কাজের জণ্য যে মুন্তাখাব নির্বাচিত সংকলন রচনা করেছেন, তাতে জিহাদের অধ্যায় পুরোটাই শামিল করেছেন।

এর দ্বারা স্পষ্ট উদ্দেশ্য এটাই যে , তাদের কাজও একটি জিহাদ। এ বিষয়ে মাওলানা ওমর পালনপুরী রহঃ এর সাথে অধমের আলোচনা ও চিঠি আদান প্রদান হয়েছে। হযরতের মনোভাব এমন ছিল যে, আমাদের তাবলীগী কাজও

জিহাদ। তিনি এক চিঠিতে দলিল হিসাবে এ কথা আমাকে লিখেছেন যে, তিরমিযি শরীফের একটি রেওয়ায়েতে তাবেঈ উবায়াহ রহঃ মসজিদে যাওয়াকে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে কেন তা প্রয়োগ করা যাবে না? আমি উত্তরে লিখেছি যে —

প্রথমতঃ

উবায়াহ রহঃ কোন সাহাবী নন। হানফী আলেমদের নিকট সাহাবীদের কথা **حجت**বা দলিল। কিন্তু তাবেঈদের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর কথা হল **هم رجال ونحن رجال**—তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। অর্থাৎ তাঁদের কথা আমাদের হানফী আলেমদের নিকট **حجت** বা স্বতন্ত্র দলিল নয়। যদি কোন সাহাবী এই পরিভাষাটি "আম" (ব্যাপক) করতেন তাহলে একটা কথা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ

একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগই কেন এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে? যদিও কোন কোন ভাইকে বলতে শুনা যায় — তাবলীগই দ্বীনি কাজ। হযরত রহঃ এমন বলতেন না। যদিও তিনি বলতেন তাবলীগও দ্বীনি কাজ। কিন্তু তাবলীগ জামাতের ভায়েরা "ও" কে "ই" দ্বারা পাল্টে দিয়েছেন।

মোটকথা, তারা নিজেদের কাজকেই জিহাদ বলেন। বরং তারা হয়তো হাকীকী জিহাদকেও জিহাদ মনে করেন না। তাঁদের মতে জিহাদের ফজিলতগুলোও দাওয়াত ও তাবলীগের মাঝে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ

অন্য সকল দ্বীনি কাজ সম্পাদনকারীরা যেমন দ্বীনি শিক্ষাদান ও লেখালেখীতে ব্যস্ত আলেমরা নিজেদের কাজের জন্য **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) ও জিহাদের ফজিলত সাব্যস্ত করেন না। এরপরেও কেন তাবলীগের ভাইরা এসকল হাদীসগুলোকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন?
এই চিঠির পর মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেবের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আর কোন চিঠি আসেনি। কোন এক চিঠিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব একটি যুক্তি পেশ

করেছিলেন যে, জিহাদ হল **حسن لغيره** অর্থাৎ সত্ত্বাগতভাবে ভালো নয় অন্য কারনে ভালো।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে জিহাদ হল জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা। আর দাওয়াত তাবলীগ স্বয়ং **حسن لذاته حسن** (সত্ত্বাগত ভালো) এটা হল আল্লাহ তা'আলা ও সৎকাজের প্রতি দাওয়াত। সুতরাং যে সব ফজিলত ও সওয়াব **حسن لغيره**এর জন্যে তা **حسن لذاته حسن**এর জন্যে কেন হবে না?

আমি উত্তরে আরজ করলাম এভাবে ক্বিয়াস (যুক্তি) দ্বারা সওয়াব সাব্যস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ক্বিয়াসটা শরঈ আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সওয়াব বা ফাজায়েল এবং এ জাতীয় অন্যান্য **توقيفي** বিষয়ে ক্বিয়াস চলে না।(তাওক্বীফী বলা হয় এমন বিষয়কে যার বাস্তবতা বান্দার বিবেক দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। যেমন কোন সূরা পাঠে কি সওয়াব, কোন আমলে কি সওয়াব ও কোন আমলে কত গুনাহ এক্ষেত্রে আকল ব্যবহার করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। বরং কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তা সেভাবেই বহাল রাখতে হবে)

অর্থাৎ এসকল স্পষ্ট বিষয়ে কুরআন হাদীসের প্রমান আবশ্যক। তাছাড়া সওয়াবের কম বেশী কষ্টের অনুপাতে হয়ে থাকে। (যেমন হাদীসে দূর থেকে মসজিদে আগমনকারীর সওয়াবের কথা বলা হয়েছে) আর আল্লাহই ভালো জানেন, কোন কাজে কি পরিমাণ কষ্ট ও এর সওয়াব কি হবে। দুনিয়ার মানুষ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

স্পষ্ট কথা হল, কষ্টের বিবেচনায় পারিভাষিক **جهاد في سبيل الله** (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) এর ধারে কাছেও তাবলীগী কাজ পৌছাতে পারবে না। এরপরও কিভাবে জিহাদের সওয়াব ও ফজিলত ঐ কাজের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। আজ পর্যন্ত মুহাক্কিক আলেমদের কেউই এ সকল বর্ণনাকে অন্য কোন দ্বীনি কাজে ব্যবহার করেন নি।

ফায়দাঃ

উপরোক্ত আলোচনায় “ও” এবং “ই” এর কথা হয়েছে (“তাবলীগও দ্বীনি কাজ”/ “তাবলীগই দ্বীনি কাজ”)। এটা একটা উদাহরণ দ্বারা ভালোভাবে বোঝা যায়। হিন্দুস্তানের একটি বড় হীরক খন্ড, কোহিনুর। এটা অত্যন্ত মূল্যবান হীরা। যদি তা হাত থেকে পড়ে ছোট বড় পাঁচ টুকরা হয়ে যায় তাহলেও এ টুকরাগুলো মুল্যহীন হবে না। প্রতিটি টুকরার কিছু না কিছু মূল্য থাকবেই। কিন্তু কোন টুকরার এ অধিকার নেই যে সে বলবে, “আমিই ঐ কোহিনুর”। হ্যাঁ, প্রতিটি টুকরা এই কথা বলতে পারবে যে, “আমিও কোহিনুর” মানে কোহিনুরের একটি অংশ।

উক্ত উদাহরণ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, নবী সাঃ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিঃ এর সকল কাজ একটি পূর্ণ কোহিনুর ছিল। তাঁরা একই সাথে দাঈ, মুবাল্লিগ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজাহিদ ছিলেন এবং তাঁরা রাজ্যও চালাতেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই সব কাজ পৃথক পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে কোন দ্বীনি কাজকারীরা এ কথা বলতে পারেন যে, আমিও সাহাবী ওয়ালা কাজ করি। কিন্তু কারোরই একথা বলার অধিকার নেই যে, সে বলবে, আমিই একমাত্র সাহাবী ওয়ালা কাজ করি।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ বিষয়টি বোঝার তাউফীক দান করুন এবং যে সব ভুল-ত্রুটি হচ্ছে তার সংশোধন করুন। আমীন।

-সূত্রঃ তোহফাতুল আলমায়ী।

দারুল ইলমের মুল পোস্ট-

http://darulilm.org/২০১৭/০৩/১০/tabligpalonpuri/

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৮৪

*****